(কেবল আত্মীয় বন্ধুগণের মধ্যে বিতরণের জন্য)

নাহারবংশ-বৃত্তান্ত।

আজিমগঞ্জ নিবাসী

রায় শেতাভচাঁদ নাহার বাহাদুরের

অনুমত্যনুসারে

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র দাস এম. এ., বি. এল.

সঙ্কলিত।

Calcutta:

PRINTED BY JADU NATH SEAL,

HARE PRESS:

46, BECHU CHATTERJEE'S STREET.

1895.

বিজ্ঞাপন।

আজিমগঞ্জে কিয়দ্দিন অবস্থান কালে তত্রত্য রায় শেতাভচাঁদ বাহাদুর ও তদীয় সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু মণিলাল নাহারের সহিত আমার সবিশেষ পরিচয় হয়। তাঁহাদেরই অনুরোধ ক্রমে এই নাহারবংশ বৃত্তান্ত সঙ্কলিত হইল। মণিলাল বাবু যত্ন পূর্ব্বক সমুদয় বৃত্তান্ত সংগৃহীত না করিলে আমি এই পুস্তক খানি কদাপি লিখিয়া উঠিতে পারিতাম না। পারিবারিক বৃত্তান্ত সংরক্ষা করিবার একমাত্র অভিলাষ ব্যতিরেকে এই গ্রন্থ প্রকাশে তাঁহাদের আর কোনও উদ্দেশ্য নাই। সুতরাং এরূপ গ্রন্থ সম্বন্ধে অধিক কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

১৩০২ সাল।
খৃঃ অঃ ১৮৯৫। } শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র দাস।

নাহার-বংশ-বৃত্তান্ত।

নাহারেরা জৈন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের ওসোয়াল * শ্রেণীর অন্তর্গত। কথিত আছে, নাহার বংশের পূর্ব্ব পুরুষেরা জৈন ধর্ম্ম অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে প্রমার বংশীয় ক্ষত্রিয়

* ওসোয়ালদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটী প্রাচীন গাথা আছে, তাহার মর্ম্ম এইরূপ :—"জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর (বর্দ্ধমান) হইতে গণনায় দ্বাদশ গুরু রত্নপ্রভু সূরি শ্রীপাঠে আরোহণ করিবার কিয়দ্দিবস পরে, বর্ত্তমান যোধপুরের অন্তর্গত ওসিয়া নগরে (উপকেশ নগরে) উপনীত হইলেন। চামুণ্ডা এই নগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন, রত্নপ্রভু দেবীকে "প্রতিবোধ" (অর্থাৎ স্বধর্ম্মে দীক্ষা) দিলেন। তদবধি দেবীর নাম "সচ্চল" বা "সচ্চা" (অর্থাৎ সত্য-ধর্ম্মাবলম্বিনী) হইল। এই নগরে অবস্থান কালে রত্নপ্রভু ৩৮৪০০০ রাজবংশীয় বা রাজপুতকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করেন, এবং তাঁহারা ওসিয়া নগরের অধিবাসী বলিয়া তাঁহাদিগকে ওসোয়াল নামে আখ্যাত করেন। এই ঘটনা সম্বৎ ২২২ শ্রাবণ মাসের সিতপক্ষ অর্কবারে (রবিবারে) অষ্টমী তিথিতে সংঘটিত হয়। এই সময়ে

ছিলেন। প্রমার বংশীয় ক্ষত্রিয়গণের প্রমারই আদি পুরুষ ছিলেন। এই আদি পুরুষ হইতে গণনা করিলে, তাহার বংশীয় বর্ত্তমান রায় শ্বেতাভ চাঁদ বাহাদুর একাশীতিতম পুরুষ হইতেছেন।

প্রমার কে এবং কি জন্যই বা তিনি ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে যৎসামান্য আলোচনা করিলে বোধ হয় তাহা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কিন্তু আমরা স্বয়ং কিছু না বলিয়া রাজস্থানের ইতিবৃত্ত হইতেই প্রমারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিব। প্রমার অগ্নিকুলের অন্যতম ছিলেন। হিন্দু ধর্ম্মের প্রাধান্য রক্ষার জন্যই অগ্নিকুলের উৎপত্তি। সেই উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রবাদ এইরূপ :—

"যে সময়ে ধর্ম্মবীর পার্শ্বনাথ * সমুত্থিত হইয়া সমগ্র হিন্দু-

ওসিয়া নগরে উপপল বা উৎপল নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনিও সপরিবারে জৈন ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ঐইরূপে ওসবংশ মধ্যে প্রথমতঃ পাঁচ শত বিভিন্ন গোত্রের সংস্থাপন হয়।"

ওসিয়া নগরের রাজপুতেরা জৈন ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া ওসোয়াল হইলে, হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের যজন যাজন পরিত্যাগ করিলেন। যাঁহারা তাঁহাদের যজনযাজন করিতে স্বীকৃত হইলেন, তাঁহারা "ভোজক" ব্রাহ্মণ নামে বিখ্যাত হইলেন। এই ভোজকেরা জৈন ব্যতীত আর কোনও জাতির দানাদি গ্রহণ করেন না।

* টড্ সাহেবের মতানুসারে সর্ব্ব সমেত চারি জন বুদ্ধের অস্তিত্ব

সমাজে ঘোর বিপ্লবের সমুদ্ভাবন করিয়াছিলেন, ঠিক সেই

সপ্রমাণ হইতে পারে। তিনি বলেন যে উক্ত চারি জনেই একেশ্বর-বাদী ছিলেন এবং উক্ত ধর্ম্ম মধ্য-আসিয়া হইতে আনয়ন করিয়া ভারতে প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র সকল শঙ্কু-শীর্ষাকারের এক প্রকার বর্ণমালায় লিখিত। সৌরাষ্ট্র, যশল্মীর এবং বিশাল রাজস্থান প্রদেশের যে যে স্থলে বৌদ্ধ ও জৈনগণ পূর্ব্বে বাস করিতেন, টড্ সাহেব তৎসমস্ত প্রদেশে বিচরণ করিয়া তাঁহাদের ধর্ম্মসংক্রান্ত অনেক শিলালিপি ও তাম্রশাসন আবিষ্কার করিয়াছিলেন। উক্ত বুধ চতুষ্টয়ের নাম নিম্নে প্রকটিত হইল।

প্রথম বুধ (চন্দ্রবংশ প্রতিষ্ঠাতা) অনুমান খৃঃ পূঃ ২২৫০ অব্দে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।
দ্বিতীয় ,, নেমিনাথ (জৈনদিগের মতে দ্বাবিংশ) ,, ১১২০ ,, ,,
তৃতীয় ,, পার্শ্বনাথ (জৈনদিগের মতে ত্রয়োবিংশ) ,, ৬৫০ ,, ,,
চতুর্থ ,, মহাবীর (জৈনদিগের মতে চতুর্ব্বিংশ) ,, ৫৩৩ ,, ,,

(বরাট প্রেস হইতে প্রকাশিত রাজস্থানের টীকা।)

কিন্তু জৈন ধর্ম্মাবলম্বিগণ এই মত বিশ্বাস করেন না। তাঁহাদের মতে চতুর্বিংশ তীর্থঙ্কর ছিলেন। (টড্ সাহেব সম্ভবতঃ এই তীর্থঙ্করগণকেই বুধ বলিয়াছেন।) টড্ সাহেবের সময় গণনাও তাঁহাদের মতে ঠিক নহে। জৈনদিগের মতে বিক্রমাদিত্যের সম্বৎ আরম্ভ হইবার ৪৭০ বৎসর পূর্ব্বে মহাবীর (বর্দ্ধমান) তীর্থঙ্কর মুক্তি লাভ করেন এবং তাঁহার মুক্তি লাভের ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। বর্দ্ধমান তীর্থঙ্কর বিহার প্রদেশের অন্তঃপাতী পাওয়াপুরী নামক গ্রামে কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। ঐ স্থান ও ঐ দিনকে পবিত্র মনে করিয়া অদ্যাবধি যাত্রিগণ ঐ স্থানে ঐ দিবসে বিশেষ সমারোহের সহিত ধর্ম্মোৎসব করিয়া থাকেন।

সময়েই অগ্নিকুল * উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই ভীষণ ধর্ম্ম-সংঘর্ষ কালে পরাক্রান্ত জৈনদিগের আক্রমণ হইতে আপনাদের ধর্ম্ম রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে ব্রাহ্মণগণ উক্ত আগ্নাবীরদিগকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

"রাজস্থানের মধ্যে আবু বা অর্বুধ নামে একটী প্রসিদ্ধ পর্ব্বত আছে,। উক্ত পর্ব্বতের উচ্চতম শৃঙ্গদেশই এই ভীষণ ধর্ম্ম-বিপ্লবের প্রধান রঙ্গস্থল। কথিত আছে, সেই তুঙ্গশৈল-শিখরের উপরিভাগেই ব্রাহ্মণগণ অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বালিত করিয়া উক্ত বীরকুলকে সৃষ্টি করিয়া ছিলেন। সেই পবিত্র অগ্নিকুণ্ড যে স্থলে প্রজ্বালিত হইয়াছিল, আজিও তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকে অনুমান করেন যে, দৈব-শক্তি-সম্পন্ন ব্রাহ্মণগণ নাস্তিকাক্রমণ† হইতে সনাতন হিন্দু ধর্ম্মকে সংরক্ষা করিবার জন্য সেই সমস্ত আগ্নাবীরদিগকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া লইয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগেরই সাহায্যে সেই ভয়ানক ধর্ম্ম-বিগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়া ছিলেন।

"ব্রাহ্মণগণের অদ্ভুত তপোবলে পাপনাশন বিভাবসু হইতে যে বীরকুল সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহারা অনেক

* অগ্নিকুল চারিটী শাখায় বিভক্ত:—প্রথম, প্রমার; দ্বিতীয়, পুরীহর; তৃতীয়, চৌলুক বা শোলাঙ্কী; এবং চতুর্থ, চৌহান।

† ব্রাহ্মণেরা জৈন ও বৌদ্ধদিগকে নাস্তিক বলিতেন।

দিন পর্য্যন্ত আপনাদের প্রচণ্ড প্রতাপ ও অক্ষুণ্ণ ধর্ম্মানুরাগ অটল রাখিতে পারিয়াছিলেন; কিন্তু মুসলমানদিগের অভিযানের সময়ে অগ্নিকুলের অধিকাংশ সেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া জৈন বা বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ছিলেন।" *

কালের কি বিচিত্র গতি! যে জৈন-ধর্ম্ম-বিধ্বংসের নিমিত্ত প্রসিদ্ধ অগ্নিকুলের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং যে অগ্নিকুলের মধ্যে প্রমারই সর্ব্বাগ্রে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া ছিলেন, কালক্রমে সেই প্রমারেরই পঞ্চত্রিংশ পুরুষ আশ-ধীরজী সনাতন হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক জৈন ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ছিলেন। আমরা যথাস্থানে এই বৃত্তান্ত বিবৃত করিব।

নাহার-বংশ-তালিকায় দৃষ্ট হয় যে, রাজস্থানের অন্তর্গত অনরকুণ্ডনামক† স্থানে প্রমারের আদিবাস ছিল। প্রমার

* বরাট প্রেস হইতে প্রকাশিত রাজস্থানের বঙ্গানুবাদ হইতে উদ্ধৃত।

† ইতিহাসে "অনরকুণ্ড" নামক কোন স্থানের উল্লেখ দেখা যায় না। সম্ভবতঃ "অনরকুণ্ড" "অনলকুণ্ডের" অপভ্রংশ হইবে। অগ্নিকুলেরা অনলকুণ্ড হইতেই প্রথমে সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন। বোধ হয় সেই অনলকুণ্ডই "অনরকুণ্ড" হইয়াছে। প্রমারেরা যে সকল নগর অধিকৃত ও স্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহাদের নাম এই:—

বংশ কালক্রমে নানা শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত হয়। নাহারেরা যে শাখার বংশধর, প্রমার হইতে গণনায় তাহার নবম পুরুষ ধীর রাওজীকে আমরা ধারা নগরীর অধিবাসী দেখিতে পাই। সপ্তদশ পুরুষ প্রেমরাওজী চক্রবর্ত্তী উপাধি ধারণ করিয়া গড় খাম্বাজ নামক স্থানে বাস করেন। সম্ভবতঃ তিনি উক্ত স্থানের রাজাও ছিলেন। অষ্টাদশ পুরুষ হইতে সপ্তবিংশ পুরুষ পর্য্যন্ত সকল ব্যক্তিই রাজোপাধিবিশিষ্ট ছিলেন, কেবল বিংশ পুরুষের উক্ত প্রকার কোন উপাধি দৃষ্ট হয় না। বিংশ হইতে ত্রিংশ পুরুষ পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তিরই রাজোপাধি দেখিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু একত্রিংশ পুরুষ বিজয় পালের উক্ত উপাধি দৃষ্ট হইয়া থাকে। তিনি গড়খাম্বাজ পরিত্যাগ করিয়া কোঁপনগরে আসিয়া রাজত্ব করেন। নাহারগণের বংশ তালিকায় ইহার পরে আর কোন ব্যক্তিকে রাজোপাধি-বিশিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় না।

মহেশ্বর (মাহিষ্মতি), ধারা, মান্দু, উজ্জয়িনী, চন্দ্রভাগা, চিতোর, আবু, চন্দ্রাবতী, মৌ, মৈদান্ন, প্রমারবতী, অমরকোট, বিথার, লোহুর্ব্বা ও পত্তন। কেহ কেহ অনুমান করেন, এই অমরকোটই অনরকুণ্ড হইবে। কিন্তু অমরকোটই যে প্রমারের আদি বাস ছিল, তাহার প্রমাণ কি?

কথিত আছে, প্রমার বংশীয়-গণের পঞ্চত্রিংশ পুরুষ আশধরজী প্রথমে "নাহার" উপাধি ধারণ করেন। এই উপাধি-ধারণ সম্বন্ধে একটী কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। প্রবাদ এই যে, স্বয়ং দেবী (ভগবতী) ব্যাঘ্রীর রূপ পরিগ্রহ করিয়া শৈশবকালে আশধরকে অরণ্যে ধরিয়া লইয়া যান। ব্যাঘ্রীরূপিণী ভগবতী অনুকম্পা-পরবশ হইয়া ইহার প্রাণনাশ করেন নাই। পরন্তু স্বীয় স্তন্যদুগ্ধে ইহাকে লালিত পালিত করেন। ব্যাঘ্রীর স্তন্যে পরিবর্দ্ধিত হইয়া আশধরজী কিয়ৎকাল পরে অরণ্য হইতে লোকালয়ে প্রত্যাগমন করেন এবং প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া "নাহার" (অর্থাৎ ব্যাঘ্র) উপাধি ধারণ করেন। এই সময়ে ইনি বিষ্ণু ধর্ম্ম (অর্থাৎ হিন্দু ধর্ম্ম) পরিত্যাগ করিয়া মন্থদেব সূরি নামক জনেক জৈনধর্ম্ম-প্রচারকের নিকট জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত হন। সুতরাং নাহার বংশীয়গণের মধ্যে ইনিই আদি জৈন। আশধরজী সম্বৎ ৭১৭ সনের আশ্বিন মাসে কৃষ্ণা সপ্তমীতে মহানগরে জৈনধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া নাহার উপাধি ধারণ করেন।*

* ব্যাঘ্রীরা যে সময়ে সময়ে মানবশিশুকে ধরিয়া মমতা বশতঃ বিনষ্ট করে না, তাহার উদাহরণ বিরল নহে। রোমের আদি রাজা ও প্রতিষ্ঠাতা রোমস্ এবং তাঁহার ভ্রাতা রেমিউলস্ এইরূপে ব্যাঘ্রী

আশধরজী লোকান্তরিত হইলে, নাহারেরা কিয়ৎকাল মহানগরেই বাস করেন। কিন্তু সপ্তচত্বারিংশ পুরুষ অন্বেষী জি নাহারকে আমরা মাড়োয়ারের অধিবাসী দেখিতে পাই। পঞ্চাশৎ পুরুষ সংশমলজী মাড়োয়ার পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভীলমাড়ে, ত্রি-সপ্ততি পুরুষ কমর মলজী ভীলমাড় পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাধঁড়িয়া ডেলেনাতে এবং চতুঃসপ্ততিপুরুষ তেজকরণ জী শেষোক্ত স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিকানীর রাজ্যের অন্তর্গত দেগাঁ নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন। সপ্তসপ্ততি পুরুষ পৃথ্বীসিংহের পুত্র খড়্গ সিংহজী দেগাঁ পরিত্যাগ করিয়া আগ্রা নগরে মতি-কাটরা নামক স্থানে বাস করেন। এই স্থানে কিয়দ্দিন বাস করিবার পর, তিনি অনুরুদ্ধ হইয়া বঙ্গদেশে আগমন করেন। বঙ্গদেশের মধ্যে আজিমগঞ্জ, দিনাজপুর ও কলিকাতা নগরীতে তিনি কুঠী নির্ম্মাণ করেন। আজিমগঞ্জই এক্ষণে নাহার বংশের আবাস স্থান এবং দিনাজপুর তাঁহাদের কর্ম্মস্থান মাত্র।

দ্বারা পালিত হইয়াছিলেন। আমাদের দেশেও এইরূপ দুই একটী ঘটনার কথা সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

খড়্গা সিংহ।

খড়্গা সিংহ তেজস্বী ব্যক্তি ছিলেন। উদ্যমশীলতা, অমায়িকতা, বিচক্ষণতা ও পরোপকারিতা তাঁহার চরিত্রের প্রধান অলঙ্কার ছিল। তিনিই বঙ্গদেশে নাহার বংশের বর্ত্তমান অভ্যুদয়ের আদি; সুতরাং এ স্থলে তাঁহার জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে।

খড়্গা সিংহ বিকানীরের অন্তর্গত দেগাঁ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। দেগাঁয়ে নাহারেরা বেশ সঙ্গতিসম্পন্ন ছিলেন এবং সম্ভবতঃ সেখানে তাঁহাদের বিলক্ষণ প্রাধান্য প্রতিপত্তিও ছিল। উক্ত স্থানেই খড়্গাসিংহের বিবাহ হয়। জৈনদিগের বিবাহ প্রথার মধ্যে "তোরণ স্পর্শ" নামে একটী রীতি প্রচলিত আছে। অর্থাৎ বর বিবাহ করিতে যাইবার পূর্ব্বে মহাড়ম্বরে একবার কন্যা-গৃহের বহির্দ্বার (তোরণ) স্পর্শ করিয়া আসেন। এই রীতিই "তোরণ স্পর্শ" নামে অভিহিত হয়। তোরণ স্পর্শ করিতে যাইবার সময় বর বহুমূল্য পরিচ্ছদাদি ধারণ করিয়া, আত্মীয়-কুটুম্ব-সহ, বিশেষ ঘটার সহিত অশ্বপৃষ্ঠে গমন করিয়া থাকেন। সাধারণ

ব্যক্তিবর্গের অশ্বপৃষ্ঠে গমন করাই রীতি; কেবল রাজা ও রাজবংশীয়েরাই হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তোরণস্পর্শ করিতে যান। খড়্গসিংহ রাজা না হইলেও রাজবংশীয় ছিলেন। কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা আপনাদের বংশ-মর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়া,সাধারণ ব্যক্তিবর্গের ন্যায় অশ্বপৃষ্ঠেই তোরণস্পর্শ করিয়া আসিতেন। খড়্গ সিংহ ধনগর্ব্বে ও বীর্য্যগর্ব্বে প্রমত্ত হইয়া রাজবংশের পূর্ব্বরীতি নিজ পরিবারে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। তদনুসারে তিনি অভ্যস্ত রীতি পালন না করিয়া বিলক্ষণ আড়ম্বরের সহিত হস্তি পৃষ্ঠেই আরোহণ পূর্ব্বক তোরণস্পর্শ করিয়া আসিলেন। তোরণস্পর্শের পর বিবাহও হইয়া গেল। কিন্তু এই কথা তত্রত্য প্রদেশের অধিপতির কর্ণগোচর হইল। অধিপতি বোধ হয় খড়্গসিংহের বংশবিবরণ অবগত ছিলেন না। সুতরাং তিনি তাঁহার ও তদীয় অভিভাবকবর্গের এই আস্পর্দ্ধা দেখিয়া ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। জনেক নিম্ন মর্য্যাদা-সম্পন্ন ব্যক্তি কর্ত্তৃক পবিত্র রাজাধিকার এইরূপে আক্রান্ত ও রাজ-সম্মান এইরূপে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, ইহা চিন্তা করিয়া তাঁহার ক্ষোভের আর পরিসীমা রহিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ অনুচরবর্গকে আস্পর্দ্ধাশীল খড়্গসিংহের ও তদীয় পিতা পৃথ্বী সিংহের ছিন্ন মুণ্ড আনয়ন করিতে কঠোর

আদেশ প্রদান করিলেন। সশস্ত্র অনুচরেরাও তদ্দণ্ডেই খড়্গসিংহের গৃহাভিমুখে প্রধাবিত হইল। এ দিকে খড়্গ সিংহ ও তাঁহার পিতা অগ্রেই এই আসন্ন বিপৎ-পাতের সংবাদ অবগত হইয়া, রাজানুচরেরা উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই, সপরিবারে দেগাঁ পরিত্যাগ করিয়া আগ্রাভিমুখে পলায়ন করিলেন। রাজসৈন্যবর্গ দেগাঁয়ে উপস্থিত হইয়া কেবল তাঁহাদের শূন্য গৃহ মাত্র দেখিতে পাইল।

খড়্গসিংহ আগ্রানগরীতে উপনীত হইয়া মতি-কাটরা নামক মহল্লায় আবাস বাটী নির্ম্মাণ করিলেন। আগ্রা এই সময়ে হতশ্রী হইলেও ব্যবসায় বাণিজ্যের একটী প্রধান স্থল ছিল। সুতরাং খড়্গসিংহ এই নগরীতে ব্যবসায় কার্য্যে লিপ্ত হইলেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে খড়্গসিংহ সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। সুতরাং অত্যল্পকাল মধ্যে তিনি জনেক প্রধান বণিক্ বা শেঠ (শ্রেষ্ঠী) বলিয়া সাধারণ্যে পরিচিত হইলেন। আগ্রা নগরীতে বাস কালেই তাঁহার পিতা পৃথ্বী সিংহের মৃত্যু হয়।

এই সময়ে বঙ্গদেশে মুর্শিদাবাদ নগরীতে জৈন-শ্রেষ্ঠী জগৎ শেঠ ধনে, মানে ও পদ-মর্য্যাদায় দেশীয়দিগের মধ্যে উচ্চস্থান অধিকার করিয়া ছিলেন। তিনি কোনও রাজকার্য্যানুরোধে একবার দিল্লী যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে

আগ্রা নগরীতে অবস্থান কালে স্বধর্ম্মী বণিক্ খড়্গসিংহ নাহারের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। জগৎ শেঠ খড়্গসিংহের অমায়িক ব্যবহারে যার পর নাই পরিতুষ্ট হন। মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে তাহার স্বজাতীয় ও স্বধর্ম্মী ব্যক্তিগণের সবিশেষ অভাব ছিল। সুতরাং তিনি খড়্গ সিংহকে মুর্শিদাবাদে যাইয়া বসবাস করিবার জন্য নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে অনুরোধ করিলেন। তাঁহার এইরূপ অনুরোধের অপর একটী কারণও ছিল। দিনাজপুরে কোনও ধনবান্ শ্রেষ্ঠী বণিক্ না থাকায় তত্রত্য মহারাজ রাধানাথ জগৎ শেঠের নিকট এই অভাব জ্ঞাপন করেন। জগৎশেঠও তাহা পূর্ণ করিতে প্রতিশ্রুত হন। আগ্রায় অবস্থান কালে খড়্গ সিংহকে দেখিয়া মহারাজের অনুরোধ জগৎ শেঠের স্মৃতিপথে সমুদিত হইল; সুতরাং তিনি খড়্গ সিংহকে দিনাজপুরে একটী কুঠী খুলিতে বিশেষরূপে অনুরোধ করিলেন। খড়্গ সিংহও তাঁহার অনুরোধ অবহেলা করিতে পারিলেন না। জগৎ শেঠের অনুরোধ ক্রমে খড়্গসিংহ ১১৭৩ কিম্বা ১১৭৪ সালে বঙ্গদেশে আগমন করেন। আজিমগঞ্জ ও গঙ্গার অপর তটবর্ত্তী বালুচর, মহিমাপুর, মহাজনটুলী ও কাশিমবাজার প্রভৃতি স্থানই জৈন শ্রেষ্ঠীগণের প্রধান কার্য্য ও আবাসস্থল ছিল। খড়্গ সিংহ বঙ্গদেশে আসিয়া উক্ত স্থান সমূহের

মধ্যে আজিমগঞ্জ নামক পল্লীই বসবাসের জন্য মনোনীত করিলেন। *

আজিমগঞ্জে আবাসবাটী নির্ম্মাণ করিয়া খড়্গ সিংহ ১১৭৬ সালে দিনাজপুরে একটী কুঠী খুলিলেন। আজিমগঞ্জ এবং কলিকাতা নগরীতে উক্ত কুঠীর দুইটী শাখা সংস্থাপিত হইল। কুঠীতে কুঠীয়ালী (মহাজনী) কার্য্য এবং অন্য প্রকার ব্যবসায়ও চলিতে লাগিল। খড়্গ সিংহ ব্যবসায় দ্বারা অচিরে প্রচুর প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠিলেন। মহারাজ রাধানাথ এবং ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির তত্রত্য ইংরাজ কর্ম্মচারিবর্গ সকলেই তাঁহাকে বিলক্ষণ সম্মান করিতে লাগিলেন; এক কথায় তিনি দিনাজপুর অঞ্চলের একজন গণ্য মান্য ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন।

খড়্গ সিংহ দূরদর্শী ও বিচক্ষণ ছিলেন। ব্যবসায় বাণিজ্যে যে বিস্তর অর্থ উপার্জ্জিত হয়, তাহা তিনি বেশ জানিতেন। কিন্তু তিনি ইহাও জানিতেন যে, ব্যবসায়ের পাদক্ষেপ বড়ই অস্থির ও চঞ্চল। ব্যবসায়ী কখনও লাভের

* বালুচর প্রভৃতি স্থানের ন্যায় আজিমগঞ্জও আজ কাল হতশ্রী হইয়াছে। ব্যবসায় বাণিজ্য আর কিছু মাত্র নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গঙ্গাদেবীও ধীরে ধীরে পল্লীটিকে উদরসাৎ করিতেছেন। আর কতিপয় বৎসরের মধ্যে আজিমগঞ্জের নামও বিলুপ্ত হইবে, এইরূপ আশঙ্কা হয়।

উচ্চ শিখরে আরোহণ করেন, আবার কখনও ক্ষিতির নিম্নতম গহ্বরে পড়িয়া যান। যিনি একবার পড়িয়া যান, স্বস্থানে আরোহণ করা তাঁহার পক্ষে অনেক সময়ে দুষ্কর হইয়া উঠে। কিন্তু যাঁহাদের ভূসম্পত্তি থাকে, লাভালাভের অস্থিরতা প্রায়ই তাঁহাদিগকে বিচলিত করিতে পারে না। বিশিষ্ট কারণ উপস্থিত না হইলে, তাঁহারা প্রায়ই সহসা লক্ষ্মীদেবীর বিরাগভাজন হইয়া পড়েন না। সূক্ষ্মদর্শী খড়্গসিংহ ব্যবসায়ের এই মূলতত্ত্ব অবগত হইয়া কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হইলেন। তদনুসারে ১২০৩ হইতে ১২০৬ সালের মধ্যে রাজস্বের দায়ে মহারাজ রাধানাথের কতিপয় জমিদারী লাট বিক্রীত হইবার উপক্রম হইলে, খড়্গসিংহ ইংরেজ কর্ম্মচারিবর্গের অনুরোধ ক্রমে তৎসমুদয় প্রকাশ্য নীলামে ক্রয় করিলেন। নাহার বংশের জমিদারীর ইহাই পত্তন ও আরম্ভ হইল।

জমিদারী ক্রয় করিয়া এই নবীন জমিদার সম্পত্তি রক্ষায় মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহার সদয় ও অমায়িক ব্যবহারে প্রজারা তাঁহার প্রতি যারপর নাই অনুরক্ত হইল। প্রজাপীড়নকে তিনি অতীব ঘৃণিত ও ধর্ম্ম-বিগর্হিত কার্য্য মনে করিতেন। অহিংসা, সর্ব্বভূতে দয়া এবং কাহাকেও অনর্থক কষ্ট প্রদান না করা, এই গুলিই জৈন

ধর্ম্মের মূল তত্ব। সধর্ম্মে খড়্গসিংহের বিলক্ষণ নিষ্ঠা ছিল। সুতরাং তিনি যে প্রজাপীড়নকে গর্হিত কার্য্য মনে করিবেন, তাহাব আর বিচিত্রতা কি? প্রজাগণের প্রতি তিনি কিরূপ সদয় ব্যবহার কবিতেন, তাহা একটী ঘটনার উল্লেখ করিলেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে। একবার অজন্মা হইয়া বঙ্গে ঘোর দুর্ভিক্ষ হয়। দুর্ভিক্ষে লোকের কষ্টের অবধি ছিল না। খড়্গসিংহ প্রজাগণের কষ্টে ব্যথিত হইয়া কতিপয় বৎসরের খাজনা হইতে তাহাদিগকে অব্যাহতি প্রদান করেন। এই কতিপয় বৎসরের রাজস্ব তিনি নিজ সঞ্চিত অর্থ হইতে রাজ সরকারে সরবরাহ করিয়া ছিলেন।

এইরূপ সদয় ব্যবহারে তিনি প্রজা এবং অপরাপর ব্যক্তিগণেরও অনুরাগ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়া ছিলেন। দিনাজপুরের ইংরাজ রাজপুরুষেরা তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিতেন। কোনও জমিদারী নীলাম করাইতে হইলে, তাঁহারা তাঁহাকে সংবাদ না দিয়া তাহার নীলাম শেষ করাইতেন না। খড়্গসিংহের ন্যায় সুযোগ্য জমীদার তাহা ক্রয় করিতে চাহিলে, অপর ক্রেতার প্রয়োজন কি? জগৎশেঠও খড়্গসিংহের গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার যথোচিত সমাদর করিতেন।

খড়্গসিংহ ধনে মানে, কুলে শীলে, প্রধান হইলেও, পুত্র-ধনে বহুদিন বঞ্চিত ছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে ১১৯৬ সালে তাঁহার একমাত্র পুত্রের জন্ম হয়। এই পুত্রের নাম উত্তম-চাঁদ। পুত্র হইবে না ভাবিয়া তিনি উত্তমচাঁদের জন্মের বহুকাল পূর্ব্বে মতিচাঁদ নামে একটী যুবককে পুত্ররূপে পালন করেন। কিন্তু তিনি ইঁহাকে শাস্ত্রানুসারে "দত্তক" গ্রহণ করেন নাই। খড়্গসিংহ মতিচাঁদকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন; উত্তমচাঁদের জন্মের পরেও তাঁহার সেই স্নেহের কিছুমাত্র লাঘব বা ব্যতিক্রম হয় নাই। খড়্গসিংহ ১২০৯ সালে দিনাজপুরে পীড়িত হইয়া শয্যাগত হন। এই সময়ে তিনি আপনার মৃত্যু আসন্ন বুঝিতে পারিয়া মতিচাঁদ ও উত্তমচাঁদকে তুল্যাংশে বিষয় বিভাগ করিয়া লইতে বলেন। উত্তমচাঁদ তখন অপ্রাপ্তবয়স্ক ও বিষয়কার্য্য পরিচালনে সম্পূর্ণ অসমর্থ ছিলেন। সুতরাং মতিচাঁদ বিষয়-বিভাগ-প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া সকল সম্পত্তি একত্রেই রাখিয়া দিলেন। খড়্গসিংহ পীড়িত অবস্থাতেই দিনাজপুর হইতে আজিমগঞ্জে চলিয়া আসেন। আজিমগঞ্জে উপস্থিত হইবার কিছু দিন পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

খড়্গসিংহ দেখিতে সুশ্রী পুরুষ ছিলেন না। মুখে বসন্তের চিহ্ন এবং বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম ছিল। তিনি

মধ্যমাকৃতির ছিলেন এবং মুখে শ্মশ্রুধারণ করিতেন। তিনি বিশুদ্ধ-চরিত্র, অমায়িক ও দয়ালু ছিলেন। তাঁহার সৌজন্যে সকলেই মুগ্ধ হইত। তিনি স্ত্রী, পুত্র ও ভৃত্য-বর্গ সকলেরই প্রতি যথেষ্ট স্নেহ ও অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেন। মতিচাঁদ দত্তক পুত্র রূপে গৃহীত না হইলেও, তিনি অম্লান বদনে তাঁহাকে অর্দ্ধেক সম্পত্তি প্রদান করিয়াছিলেন। স্বধর্ম্মেও তাঁহার বিলক্ষণ নিষ্ঠা ছিল; তিনি দিনাজপুরে "চন্দা প্রভু" স্বামীর এক সুগঠিত মন্দির প্রস্তুত করিয়া দেন; তাহা অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। তিনি একটী ধর্ম্মশালাও প্রস্তুত করেন। তিনি বিলক্ষণ দূরদর্শীও ছিলেন। তাঁহার দূরদর্শিতা সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বেই জমিদারী ক্রয় করিতে অভিলাষী হন। কালক্রমে ভূসম্পত্তির যে আদর বাড়িবে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। বাণিজ্যোৎপন্ন লাভের উপর তাঁহার বড় আস্থা ছিল না। ব্যবসায়ের অস্থির গতির কথা ভাবিয়া তিনি শঙ্কিত হইতেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, খড়্গ-সিংহ বিলক্ষণ তেজস্বী পুরুষ ছিলেন; কিন্তু তাঁহার এই তেজস্বিতা কখন কখন তাঁহাকে অহঙ্কৃতের ন্যায় প্রতীয়মান করিত।

উত্তমচাঁদ।

উত্তমচাঁদ ও মতিচাঁদ খড়্গাসিংহের মৃত্যুর পর সমুদয় ভূসম্পত্তি একত্র দখল করিতে লাগিলেন। মতিচাঁদ উত্তমচাঁদ অপেক্ষা বয়সে বড় ছিলেন; সুতরাং তিনি সমুদয় বিষয় কার্য্যের পরিচালনা করিতে লাগিলেন। উভয়ে পরস্পরের প্রতি সহোদর ভ্রাতার ন্যায় ব্যবহার করিতেন। স্বয়ং উত্তমচাঁদ অতীব নম্র ও কোমল প্রকৃতির ছিলেন। সর্ব্ব বিষয়েই তিনি মতিচাঁদের উপদেশ গ্রহণ করিতেন। উত্তমচাঁদ যেরূপ সুশ্রী ছিলেন, তাঁহার হৃদয়ও সেইরূপ সৌন্দর্য্য-ভূষিত ছিল। পরদুঃখে তাঁহাব হৃদয় দ্রবীভূত হইত। বালকমাত্র হইলেও, তিনি সেই বয়সেই জন-সাধারণের অনুরাগ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পরমায়ুর শেষ হইয়াছিল। ১২১৩ সালের শ্রাবণ মাসে তিনি দিনাজপুরে হঠাৎ পীড়িত হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম সপ্তদশবর্ষ মাত্র হইয়াছিল। প্রথমে কেহ রোগটী তত গুরুতর মনে করেন নাই; কিন্তু তাহা ক্রমে ক্রমে সাঙ্ঘাতিক আকার ধারণ করিল। পরিশেষে চিকিৎ-

সকেলাও তাঁহার জীবনাশা পরিত্যাগ করিলেন। সুতরাং হতভাগ্য উত্তমচাঁদ বালিকাস্ত্রীকে অনাথা করিয়া এবং আত্মীয়-স্বজনকে কাঁদাইয়া রোগের অষ্টম দিবসে সুকুমার নবীন বয়সে ইহলোক হইতে অবসৃত হইলেন।

নাহারবংশ বিষাদের প্রগাঢ় ছায়ায় সমাচ্ছন্ন হইল। * মতিচাঁদ উত্তমের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার পর বিষয় পরিচালনের ভার পূর্ব্ববৎ নিজহস্তেই রাখিবার উদ্যোগ করিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে উত্তমচাঁদ একটি "উসীনামা" সম্পাদন করেন। তদ্দ্বারা মতিচাঁদ উত্তমের "নাবালিকা" বিধবা পত্নী মায়াকুঙার বিবির ও তদীয় সমস্ত বিষয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। ঐ উসীনামাতে মায়া কুঙার বিবিকে দত্তক পুত্র গ্রহণের অনুমতিও প্রদত্ত হইয়াছিল। উসীনামার বলে মতিচাঁদ ১২১৩ সালে ৭ই ভাদ্র তারিখে আদালত হইতে সার্টিফিকেট গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই একটী কাণ্ড সংঘটিত হইল। উত্তমচাঁদের মৃত্যুর পর, তাঁহার শ্বশুর সুবিখ্যাত মেঘরাজবাবু বিধবা কন্যার পক্ষ হইতে স্বদলবলে কলিকাতা ও আজিম-

* এতাবৎকাল নাহার বংশে কেহ দত্তক পুত্র রূপে গৃহীত হইয়াছিলেন কি না, তাহা অবগত হওয়া যায় না। উত্তমচাঁদের পত্নী মায়াকুঙার বিবি গোলালচাঁদবাবুকেই প্রথমে দত্তক রূপে গ্রহণ করেন।

গঞ্জের কুঠি দখল করিলেন। মতিচাঁদ এই সময়ে দিনাজপুরে ছিলেন; সুতরাং তিনি মেঘরাজবাবুর ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার নামে আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। অভিযোগ উপস্থিত হইল বটে, কিন্তু তাহার কোনও প্রকার মীমাংসা হইবার পূর্ব্বেই ১২১৫ সালে মতিচাঁদ হঠাৎ পরলোক গমন করিলেন। মতিচাঁদ বিবাহ করেন নাই এবং তাঁহার আত্মীয় স্বজনও কেহ ছিলনা; সুতরাং এইখানেই বিবাদের শেষ হইয়া গেল। * মায়াকুঙার বিবিই নির্ব্বিবাদে সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র অধিকারিণী হইলেন।

মেঘরাজবাবু ও মায়াকুঙার বিবি।

মায়াকুঙার বিবি ১১৯৮ সালের শ্রাবণ মাসের শুক্ল পঞ্চমী তিথিতে জন্ম গ্রহণ করেন। ১২০৮ সালে অর্থাৎ দশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি উত্তমচাঁদের সহিত পরিণীতা হন। ১২১৩ সালে অর্থাৎ পঞ্চদশবর্ষ বয়ঃক্রম

* মতিচাঁদ অতিশয় ধর্ম্মানুরাগী ও বিষয় সম্পত্তির প্রতি নিস্পৃহ ছিলেন বলিয়া বিবাহ করেন নাই।

কালে তিনি বিধবা হন এবং ১২১৫ সালে অর্থাৎ সপ্ত-দশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি সমগ্র বিষয় সম্পত্তির অধি-কারিণী হন। কি জানি কন্যা এই অল্পবয়সে বিষয়কার্য্য-পর্য্যবেক্ষণে অক্ষম হন, এই চিন্তা করিয়া পিতা মেঘরাজ-বাবু স্বয়ং কন্যার বিষয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণে নিযুক্ত হই লেন। মেঘরাজ বাবু মতিচাঁদের মৃত্যুর পর কলিকাতার কুঠি উঠাইয়া দিলেন এবং দিনাজপুরের মহাজনী কারবারও বন্ধ করিয়া দিলেন। স্বতরাং মায়াকুণ্ডার বিবির এক জমীদারী ভিন্ন আর কিছুই রহিল না।

মায়াকুণ্ডার বিবির বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার পিতা মেঘরাজবাবুর যৎসামান্য বৃত্তান্ত এস্থলে বর্ণন করা বোধ করি নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। যাহার বংশের ইতিহাসের সহিত তাঁহার সংস্রব অত্যল্প হইলেও, তাঁহার স্বতন্ত্র জীবনচরিতের অভাবে এস্থলে তাঁহার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ অনেকের প্রীতিপ্রদ হইবে, সন্দেহ নাই। মেঘরাজবাবু তৎকালে আজিমগঞ্জের মধ্যে এক অদ্ভুত ব্যক্তি ছিলেন। ধনে, মানে, দানে, সদনুষ্ঠানে, অপরিমিত-ব্যয়িতায়, উচ্ছৃঙ্খলতায়, বিলাসিতায় ও সহৃদয়তায় তৎকালে এই স্থানে কেহই তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না। এই অদ্ভুত পুরুষের কাহিনী সংক্ষিপ্ত হইলেও, কাহার

না শুনিতে ইচ্ছা হয়? মেঘরাজবাবুর পিতা সুবিখ্যাত বুলাসাহা * ৪০।৫০ লক্ষ টাকা রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তখন মেঘরাজবাবুর বয়ঃক্রম ১৬।১৭ বৎসর মাত্র। এই অল্পবয়সে এই প্রভূত অর্থের অধিকারী হইয়া মেঘরাজবাবু যে বিলাস স্রোতে গা ঢালিয়া দিবেন, তাহার আর বিচিত্রতা কি? এইরূপ বয়সে এইরূপ অবস্থাপন্ন কয় জন ব্যক্তি আপনাদিগকে সংযত রাখিতে পারেন? মেঘরাজবাবু বিলক্ষণ সঙ্গীত ও আমোদপ্রিয় ছিলেন। সুতরাং তাঁহার আবাস বাটী নৃত্যগীত ও আমোদ প্রমোদে নিয়তই উৎসবের আকার ধারণ করিত। কথিত আছে, সঙ্গীত না হইলে রাত্রিতে তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইত না। মেঘরাজবাবু সর্ব্ব বিষয়েই আপনাকে লোক-বিশ্রুত করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। যেরূপে হউক, লোকমুখে তাঁহার নাম ধ্বনিত হইতে থাকিলেই তিনি আপনাকে সার্থকজন্মা মনে করিতেন। এইরূপ দৌর্ব্বল্যের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি মধ্যে মধ্যে অর্থের বিস্তর অপব্যয় করিতেন। তাঁহার

*যশজী
|
বুলাশাহ
|
বাবু মেঘরাজ
ইহাঁদের গোত্র চোরোড়িয়া

এইরূপ অপব্যয়ের দুই একটী দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদত্ত হই-তেছে। কথিত আছে, একবার জনেক আতরওয়ালা পশ্চিমাঞ্চল হইতে বহুমূল্য আতর লইয়া মুর্শিদাবাদে আসিয়াছিল। কিন্তু তাহার দুর্ভাগ্য ক্রমে সাত-শত-টাকা তোলা হিসাবে, কেহই তাহার আতর কিনিতে সম্মত হইলেন না; সুতরাং সেই ব্যক্তি মনঃক্ষোভে স্বদেশে ফিরিয়া যাইতেছিল। আজিমগঞ্জ হইয়া যাইবার কালে আতর-ওয়ালা মেঘরাজবাবুর বিলাসিতার কথা শ্রবণ করিয়া একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল এবং তাঁহার নিকট নিজ মনঃক্ষোভের কারণ নিবেদন করিল। এই সময়ে মেঘরাজ বাবুর একটী প্রিয় অশ্ব সুসজ্জিত হইয়া তাঁহার সম্মুখে অপেক্ষা করিতেছিল। মেঘরাজবাবু সাত-শত-টাকা তোলা আতরের কথা শ্রবণ করিয়া একবার তাহা দেখিতে চাহিলেন এবং সেই আতর-পূর্ণ শিশি হস্তে লইয়া অম্লানবদনে তৎক্ষণাৎ তাহা অশ্বপুচ্ছে ঢালিয়া দিলেন। আতরওয়ালা তাঁহার এই আচরণে একেবারে হতবুদ্ধি হইল। মেঘরাজবাবু তাহার সেই মনোভাব বুঝিতে পারিয়া হাসিতে হাসিতে তৎক্ষণাৎ তাহাকে সার্দ্ধ-তিন্ সহস্র মুদ্রা প্রদান করিলেন। মেঘরাজ বাবুর অপরি-মিতব্যয়িতা সম্বন্ধে এইরূপ অনেক গল্প আছে, তন্মধ্যে

আর একটী এইরূপ। মেঘরাজবাবু ঘুড়ি উড়াইতে অতিশয় ভাল বাসিতেন; কিন্তু তিনি সূতার ডোরে ঘুড়ি না উড়াইয়া স্বর্ণ বা রৌপ্যের সূক্ষ্ম তারে ঘুড়ি উড়াইতেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে সেই তার কাটিয়া দিতেন। দরিদ্র ব্যক্তিরা সেই তারযুক্ত ঘুড়ি ধরিবার জন্য ভয়ঙ্কর কোলাহল উপস্থিত করিত; মেঘরাজবাবু ছাদে দাঁড়াইয়া সেই তামাসা দেখিয়া আনন্দিত হইতেন।

মেঘরাজ বাবু আপনাকে লোক-বিশ্রুত করিবার জন্য আর একবার একটী গুরুতর কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন; কিন্তু তাহাতে তাঁহার প্রাণ-সংশয় ঘটিবার উপক্রম হইয়াছিল। যৌবনের মত্ততায় দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া মেঘরাজবাবু একবার মুর্শিদাবাদের কোনও নবাব-পুত্রীর প্রেমে আবদ্ধ হইয়া পড়েন। দুঃসাহসিক মেঘরাজ "বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা" করিয়াছিলেন। পরিশেষে একদিন প্রণয়িনীকে নিজ পশ্চাতে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া নবাব-সদন হইতে বহির্গত হইলেন। প্রথমে তাঁহারা জগৎ শেঠের গৃহে আশ্রয় লইয়াছিলেন; কিন্তু জগৎ শেঠ তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিতে অসম্মত হওয়ায়, তাঁহারা অনন্যোপায় হইয়া অশ্বপৃষ্ঠেই গঙ্গা সমুত্তীর্ণ হইলেন। বিশ্বস্ত প্রিয় "মতিঘোড়া" প্রভু'ও প্রভু-প্রণয়িনীকে পৃষ্ঠে লইয়া

প্রাণপণে ধাবমান হইল এবং অসংখ্য পশ্চাদ্ধাবী নবাব-অনুচরকে বহু দূরে ফেলিয়া নিরাপদে আজিমগঞ্জে উপনীত হইল। কিন্তু উপনীত হইয়াই "মতি" মৃত্যুমুখে পতিত হইল। এদিকে অল্পক্ষণ পরেই নবাবের সিপাহীরা মেঘরাজবাবুর আবাস বাটী বেষ্টন করিল। মেঘরাজের ছিন্ন মুণ্ড আনয়ন করিতে নবাব তাহাদিগকে আদেশ দিয়াছিলেন। মেঘরাজবাবু আপনাকে বিপন্ন দেখিয়া কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইলেন; পরিশেষে উৎকোচ দ্বারা নবাবের প্রধান কর্ম্মচারিবর্গকে বশীভূত করিয়া নিষ্কৃতি লাভের উপায় দেখিতে লাগিলেন। কর্ম্মচারীরা নবাবকে নানা প্রকারে বুঝাইতে লাগিলেন। "মেঘরাজ নবাব-বংশে যে কলঙ্ক দিয়াছে তাহা কিছুতেই অপনীত হইবার নহে। তবে একটী উপায় দ্বারা সেই কলঙ্ক ক্ষালিত হইতে পারে। মেঘরাজ যদি নবাব-পুত্রীকে মুসলমান ধর্ম্মমতে বিবাহ করে, তাহা হইলে নবাবপুত্রীর সম্মান রক্ষা হয় এবং একটা কাফেরও মুসলমান হইয়া যায়।" নবাব নাজিম এইরূপ প্রস্তাবে সম্মত হইলে, মেঘরাজবাবু দেওয়ানের হস্তে আত্ম সমর্পণ করিলেন এবং সহসা একদিন সজ্জিতবেশে শিবিকায় আরোহণ করিয়া নবাব সমীপে উপস্থিত হইলেন। মেঘরাজবাবু নবাবকে দেখিয়া ভীত, লজ্জিত

খাঁ বিচলিত হইলেন না। তিনি আপনার মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়াই গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন; তবে গৃহে পশুর ন্যায় হত হওয়া অপেক্ষা নবাব সমক্ষেই হত হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করিয়াছিলেন। মেঘরাজবাবুকে নির্লজ্জ ও অননুতপ্তের ন্যায় আসিতে দেখিয়া নবাব নাজিম ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন; কিন্তু তিনি দেওয়ানের উপদেশানুসারে শান্ত ভাব অবলম্বন করিলেন। মেঘরাজবাবু নবাবের আজ্ঞানুসারে নবাবপুত্রীকে কল্‌মা পড়িয়া বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইলে, নবাব নাজিম তাঁহাকে অভয় ও প্রাণ দান করিলেন। মেঘরাজবাবু অবিলম্বে কল্‌মা পড়িয়া নবাব-পুত্রীর পাণিগ্রহণ করিলেন; যথারীতি বিবাহ হইয়া গেল। যমালয় শ্বশুরালয়ে, এবং যমকিঙ্করেরা শরীর-রক্ষকে পরিণত হইল। নবাব নাজিম জামাতাকে প্রচুর যৌতুক প্রদান করিলেন। মেঘরাজবাবু নবাব প্রাসাদে জামাতার যথোচিত আদর ও সম্মান পাইলেন; কিন্তু কথিত আছে যে, এই অপূর্ব্ব শ্বশুরালয়ে তিনি এক পাত্র সরবৎ ব্যতীত আর কিছুই পান করেন নাই।

মেঘরাজবাবু যমালয় হইতে সদেহে প্রত্যাগমন করিয়া মহাড়ম্বরে আজিমগঞ্জে প্রবেশ করিলেন। তিনি যে জীবিত দেহে গৃহে আর প্রত্যাগমন করিবেন, ইহা কেহ স্বপ্নেও

চিন্তা ও করে নাই। সুতরাং মেঘরাজবাবুকে দেখিয়া সকলেই যারপরনাই হৃষ্ট হইল। কিন্তু তাঁহার বিবাহের কথা শুনিয়া আত্মীয় স্বজনেরা তাঁহার সহিত আহার ব্যবহার রহিত করিয়া দিলেন। ছয় মাস কাল এইরূপ চলিয়াছিল ; কিন্তু পরিশেষে জগৎ শেঠ প্রভৃতি গণ্য মান্য ব্যক্তিগণের মধ্যবর্ত্তিতায় তিনি সমাজে গৃহীত হইলেন। গৃহীত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে স্বজাতির পঞ্চায়তের সম্মুখে দোষ স্বীকার ও ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইয়াছিল এবং নবাবপুত্রীকেও সেই অবধি এক স্বতন্ত্র মহলে রাখিতে হইয়াছিল।

কথিত আছে নবাবপুত্রীর সহিত মেঘরাজবাবুর প্রকৃত প্রণয় জন্মিয়াছিল। উভয়ে পরস্পরকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন। নবাবপুত্রী এক স্বতন্ত্র মহলে বাস করিতেন বটে, কিন্তু তিনি মেঘরাজবাবুর জীবিত-কালে একটী দিনের জন্যও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন নাই। মেঘরাজবাবুর মৃত্যুর পর, তিনি আজিমগঞ্জ পরিত্যাগ করিয়া ডাহাপাড়া নামক স্থানের নিকটে "রোশ্নীবাগে" এক বাটী প্রস্তত করেন এবং সেই স্থলে মুসলমান ফকিরদের জন্য এক "লঙ্গর খানা" (অর্থাৎ অতিথিশালা) নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

নবাবপুত্রী জীবনের অবশিষ্ট কাল নির্জ্জনে অতিবাহিত করেন। *

এক লোক-বিশ্রুতির প্রবল আকাঙ্ক্ষা ব্যতীত মেঘরাজবাবুর অন্য কোন গুরুতর দৌর্ব্বল্য ছিল না। লোক-বিশ্রুত হইবার জন্য তিনি অর্থের যেরূপ অপব্যয় করিতেন, স্বাভাবিক দয়ার বশবর্ত্তী হইয়া বহুল সদনুষ্ঠান দ্বারাও তিনি তাহার সেইরূপ সদ্ব্যবহার করিতেন। তাঁহার দানের কিছু সংখ্যা ছিল না। দরিদ্রের অন্ন-কষ্ট-নিবারণ, বিপন্নের উদ্ধার এবং পীড়িতের চিকিৎসা ও শুশ্রূষণ প্রভৃতি কার্য্যে তিনি নিয়ত প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতেন। তিনি স্বয়ং অসহায় পীড়িত ব্যক্তিদিগকে দেখিতে যাইতেন এবং নিজব্যয়ে তাহাদের সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া

* মেঘরাজবাবুর মৃত্যুর পর নবাব বংশ হইতে এইরূপ এক প্রস্তাব আইসে যে, নবাবপুত্রী দ্বারা মেঘরাজবাবুর যদি কোন দত্তকপুত্র গৃহীত হয়, তাহা হইলে সেই পুত্রকে Political Pensioner করিবার চেষ্টা দেখা যাইবে। কিন্তু ময়াকুওার বিবি সেই প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। হইলে, ব্যবহারজীবী ও বিচারক মহাশয়দের সমক্ষে হিন্দু আইনের একটী অভিনব সমস্যা উপস্থিত হইত। তাহারেরা মেঘরাজবাবুর দৌহিত্র বংশ বলিয়া নবাব বংশের সহিত তাঁহাদের সৌহার্দ্দ্য সংস্থাপিত হয়। অনেক দিন পর্য্যন্ত, উভয় বংশের মধ্যে প্রীতি-উপঢৌকনের বিনিময় চলিয়াছিল।

দিয়া তাহাদের অজ্ঞাতসারে উপাধানের নীচে প্রয়োজনীয় মুদ্রাও রাখিয়া আসিতেন। তিনি নিজব্যয়ে চারিজন কবিরাজ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অসহায় পীড়িত ব্যক্তিগণের চিকিৎসা করা তাঁহাদের কার্য্য ছিল। কথিত আছে, প্রত্যেক চিকিৎসকের সঙ্গে কতিপয় ভারবাহী ব্যক্তি রোগীর আবশ্যক ঔষধ ও পথ্যাদি লইয়া ভ্রমণ করিত। কবিরাজ যে ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিতেন, ভারবাহী ব্যক্তিরা তৎক্ষণাৎ তাহা রোগীকে প্রদান করিত।* এইরূপ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান ব্যতীত তিনি বিপন্ন ও দুঃস্থ

---

* আজিমগঞ্জের নিকটবর্ত্তী বড়নগরে সুবিখ্যাত রাণী ভবানীর এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। মেঘরাজবাবু তাঁহারই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া থাকিবেন। ৺নীলমণি বসাক প্রণীত "নবনারী" নামক গ্রন্থে এইরূপ বৃত্তান্ত আছে:—"রাণী ভবানীর রাজ্যের রোগীদিগের চিকিৎসা করাইবার অতি উত্তম ধারা ছিল, তিনি আটজন বৈদ্য বেতন দিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহারা বড়নগর ও তচ্চতুঃপার্শ্বস্থ সাতখান গ্রামের সমুদায় রোগী লোকের চিকিৎসা করিয়া বেড়াইত। ঐ আটজন বৈদ্যের দুই দুই ভৃত্য নিয়োজিত ছিল। তাহারা রোগীদিগের শুশ্রূষা ও ঔষধ প্রস্তুত করিয়া দিবার জন্য বৈদ্যদিগের সঙ্গে সঙ্গে যাইত। তদ্ভিন্ন প্রত্যেক বৈদ্যের সঙ্গে দুই তিন জন ভারী পাঁচন, * * পুরাতন তণ্ডুল, মুগের দাইল, মিছরী ও রোগীর অন্যান্য আহারীয় দ্রব্য লইয়া যাইত। যে রোগীর যে দ্রব্য আবশ্যক হইত, তাহা, বৈদ্যের বিধান মত প্রস্তুত করিয়া দিত।" (ষষ্ঠ সংস্করণ ২৬৪ পৃষ্ঠা।) বড়নগর আজিমগঞ্জের একমাইল উত্তরে অবস্থিত।

ব্যক্তিদিগকে বিস্তর দানও করিতেন। যে সকল সম্ভ্রান্ত বংশীয় দরিদ্র ব্যক্তি প্রকাশ্যে তাঁহার নিকট দান লইতে সঙ্কুচিত হইতেন, তিনি কৌশল ক্রমে তাঁহাদিগকে অর্থ প্রদান করিতেন। কথিত আছে, মেঘরাজ বাবুর বহির্দ্বার দিবারাত্রি অবারিত থাকিত। যখন যাহার প্রয়োজন হইত, সে তখনই মেঘরাজবাবুর নিকট উপস্থিত হইয়া নিজ অভাব জ্ঞাপন করিতে পারিত। মেঘরাজবাবু একটী "সদাব্রত"ও খুলিয়া ছিলেন, তাহাতেও বিস্তর লোক প্রতিপালিত হইত। তিনি জন-সাধারণের সুবিধার জন্য গঙ্গার একটী ঘাট বাঁধাইয়া দিয়াছিলেন এবং তৎ-সমীপে একটী ধর্ম্মশালাও নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন। এতৎ-সমুদায়ই এক্ষণে গঙ্গাগর্ভে বিলুপ্ত হইয়াছে।*

* এই সকল দান ও সদনুষ্ঠানের জন্য মেঘরাজ বাবু "বাবু" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ তাঁহার নামের প্রথমে "বাবু" শব্দের বিশিষ্ট অর্থ ছিল। কথিত আছে, লোকে বলিত "বাবু তো মেঘরাজ, আওর সব বাবোইয়া" অর্থাৎ বাবু ত বাবু মেঘরাজ আর সকলে বাবুই পক্ষী। নাহারেরা বলেন, নবাব পুত্রীর সহিত বিবাহের পর নবাব নাজিম মেঘরাজবাবুকে রাজা উপাধি দিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু মেঘরাজ আপনার "বাবু" উপাধি ত্যাগ করিতে সম্মত না হইয়া বলিয়াছিলেন, "রাজা (উপাধি) লইয়া কি করিব, রেজাই (গাত্রবস্ত্র) তো গৃহে অনেক আছে।"

নিরন্তর ব্যয় করিতে থাকিলে, কুবেরেরও ভাণ্ডার শূন্য হইয়া যায়; সুতরাং কালক্রমে মেঘরাজবাবুর যে অবস্থা বিপর্য্যয় ঘটিবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? মেঘরাজ-বাবুর মন তেমনই প্রশস্ত এবং হৃদয় তেমনই উদার থাকিল, কিন্তু তাঁহার সঞ্চিত অর্থ ক্রমে ক্রমে নিঃশেষ হইয়া গেল। আকাঙ্ক্ষা রহিল, কিন্তু আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার কোনও উপায় রহিল না। মেঘরাজবাবুর ঘোর দুর্দ্দিন উপস্থিত হইল। তিনি অল্পকাল মধ্যে দুশ্ছেদ্য ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িলেন।

এই সময়ে তাঁহার কন্যা মায়াকুঁওার বিবি বিধবা হন। একমাত্র কন্যার বিপদে মেঘরাজবাবু অতিশয় কাতর হইয়া তাঁহার বিষয়াদির সুবন্দোবস্তের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, মতিচাঁদের মৃত্যুর পর মায়াকুঁওার বিবিই সমগ্র বিষয়ের একমাত্র অধিকারিণী হইলেন। মেঘরাজবাবু সেই অবধি কন্যার বিষয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত থাকিলেন। কন্যা ব্যয়াদি সম্বন্ধে পিতার মুক্তহস্ততার বিষয় জানিয়া তাঁহাকে প্রচুর অর্থ প্রদান করিতেন। কিন্তু মেঘরাজবাবুর মন কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করিত না।

মেঘরাজবাবুর গৃহে গোলাল চাঁদ নামে একটী বালক

থাকিত। ১২০৪ সালে মহিমাপুরের এক উচ্চ বংশে এই বালকের জন্ম হয়।* ১২২২ সালে অর্থাৎ গোলালচাঁদের অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে, মায়াকুণ্ডার বিবি পিতার উপদেশ ও অনুরোধক্রমে ইঁহাকে দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। এই সময়ে মায়াকুণ্ডার বিবি চতুর্ব্বিংশ-বর্ষীয়া ছিলেন। গোলালচাঁদ পুত্ররূপে গৃহীত হইয়া বিষয়কর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। মেঘরাজবাবু চিরাভ্যস্ত অমিতব্যয়িতার বশবর্ত্তী হইয়া কন্যার অর্থের বিস্তর অপব্যয় করিতে লাগিলেন। কথিত আছে, কন্যা ব্যয় করিবার জন্য পিতাকে বিস্তর অর্থ দিয়াছিলেন। কিন্তু বুদ্ধিমতী মায়াকুণ্ডার বিবি অতঃপর একটু সাবধানতার সহিত চলিতে লাগিলেন। একদিন তিনি পিতার এই অমিতব্যয়িতার প্রকাশ্য প্রতিবাদ করিলেন। মেঘরাজবাবু কন্যার ব্যবহারে আপনাকে বিলক্ষণ অবমানিত মনে করিয়া তৎক্ষণাৎ মনঃক্ষোভে তাঁহার বাটী পরিত্যাগ করিলেন। ইতঃপূর্ব্বেই তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়াছিল; সুতরাং তিনি বায়ু পরিবর্ত্তনের উদ্দেশে বিহার অঞ্চলে

* গোলালচাঁদের জনকের নাম করমচাঁদ ভনশালী। ইঁহার বাটী মহিমাপুরে ছিল : এই সময়ে ইঁহাদের অবস্থা ভাল ছিল না।

গমন করিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে "মনের" নামক স্থানে তাঁহার মৃত্যু হয়। ১২২৯ সালে এই ঘটনা হইয়াছিল।

মেঘরাজবাবুর মৃত্যুর পর উত্তমর্ণেরা ঋণের দায়ে তাঁহার বিষয় সম্পত্তি নিলাম করাইতে লাগিলেন। মায়াকুণ্ডার বিবি এই সময়ে দিনাজপুরে ছিলেন; সুতরাং, তাঁহার অগোচরে মেঘরাজবাবুর বিস্তর মূল্যবান সম্পত্তি পরহস্তগত হইল। তিনি যখন আজিমগঞ্জে আসিলেন, তখন পিতার বৃহৎ আবাস বাটীটি বিক্রীত হইবার উপক্রম হইতেছিল। মায়াকুণ্ডার বিবি কালবিলম্ব না করিয়া তাহাই ক্রয় করিলেন। ইহাই নাহারদিগের বর্ত্তমান আবাস বাটী। ইহার নাম আয়না মহল।*

---

* আজি কালিকার ন্যায় পূর্ব্বে জানালাতে শার্শির ব্যবহার ছিলনা। কথিত আছে, আজিমগঞ্জের মধ্যে মেঘরাজবাবুই সর্ব্ব প্রথমে শার্শির জানালা ব্যবহৃত করেন। এই কারণে, উক্ত বাটী "আয়না মহল" নামে অভিহিত হইয়াছে।

মায়াকুণ্ডার বিবি ও গোলালচাঁদ বাবু।

মেঘরাজবাবুর মৃত্যুর পর সমস্ত বিষয়কার্য্য পরিচালনের ভার মায়াকুণ্ডার বিবির উপরেই ন্যস্ত হইল। শুধু বিষয় কার্য্য পরিচালনা নহে; এই সময়ে তাঁহাকে একটী গুরুতর গৃহবিবাদেও লিপ্ত হইতে হইল। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ১২২২ সালে মায়াকুণ্ডার বিবি গোলালচাঁদকে দত্তকপুত্র রূপে গ্রহণ করেন। কিন্তু কুক্ষণেই গোলালচাঁদ পুত্ররূপে গৃহীত হইয়াছিলেন। গোলালচাঁদ মায়াকুণ্ডার বিবির সংসারে প্রবেশ করা অবধি কর্ম্মচারিবর্গের, বিশেষতঃ মানসিংহ নামে জনেক পুরোহিতের এবং পরিশেষে স্বয়ং বিবিসাহেবারও অতিশয় বিরাগভাজন হইয়া পড়েন। গোলালচাঁদ দরিদ্রের সন্তান হইলেও বেশ বুদ্ধিমান্ ও বিচক্ষণ ছিলেন। তাঁহার চরিত্রও পবিত্র ছিল। মায়া-কুণ্ডার বিবি কর্ত্তৃক দত্তকপুত্ররূপে গৃহীত হইয়া তিনি স্বভাবতঃই আপনাকে নাহার বংশের সমগ্র সম্পত্তির অধিকারী মনে করিতে লাগিলেন। গোলালচাঁদ এই সময়ে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার এইরূপ মনে করা কিছু বিচিত্র ব্যাপারও নহে। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, একটী অজ্ঞাতনামা দরিদ্রবংশীয় যুবককে ভাগ্য-

ক্রমে সহসা উচ্চপদে আরোহণ এবং সকলের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করিতে দেখিয়া অনেকের ঈর্ষানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং অনেকেই তাঁহার সর্ব্বনাশসাধনের জন্য বদ্ধপরিকর হইল। এই শেষোক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে পূর্ব্বোল্লিখিত মানসিংহ পুরোহিত অন্যতম ছিল। ইহারই চেষ্টাতে মায়াকুঙার বিবি পুত্রের উপর অতীব বিরক্ত হইলেন। মাতাপুত্রের মধ্যে মনোমালিন্য ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল; পরিশেষে মায়াকুঙার বিবি গোলালচাঁদের উপর এরূপ ক্রুদ্ধ হইলেন যে, তিনি তাঁহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার নিমিত্ত প্রতিজ্ঞা করিলেন।

একদিন গোলালচাঁদ প্রাত্যহিক অভ্যাসানুসারে গঙ্গাতে স্নান করিয়া গৃহপ্রবেশের উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে বহির্দ্বাররক্ষক তাঁহাকে গৃহাভ্যন্তরে যাইতে নিষেধ করিল। দ্বাররক্ষকের এই অভূতপূর্ব্ব আচরণে গোলালচাঁদ অতীব বিস্মিত হইলেন। তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া দ্বাররক্ষক বলিল, "মহাশয়, আপনার গৃহপ্রবেশের অনুমতি নাই। আপনাকে গৃহমধ্যে না যাইতে দিবার জন্য বিবিসাহেবা আমাদের উপর কঠোর আদেশ প্রচার করিয়াছেন; আমি সেই আদেশ পালন করিতেছি মাত্র। আপনি অন্যত্র গমন করুন।" বিস্ময়ে, ক্ষোভে ও রোষে

গোলালচাঁদ কিয়ৎক্ষণ বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে সমর্থ হইলেন না। পরিশেষে আপনার বিরুদ্ধে মানসিংহ পুরোহিতের ষড়যন্ত্রের কথা স্মরণ পূর্ব্বক তিনি অনুচর ভৃত্যকে পরিত্যাগ করিয়া সেই অবস্থায় সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। পরিধেয় বস্ত্রখানি, একটী গাত্রমার্জ্জনী ও কণ্ঠে একছড়া স্বর্ণের মালা ব্যতীত তাঁহার নিকটে আর কিছুই রহিল না। এরূপ অবস্থায় তিনি কোথায় যাইবেন এবং কি করিবেন, প্রথমে তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি বুঝিতে পারিলেন, মায়াকুঙার বিবি যখন নিজ বহির্দ্বার বন্ধ করিয়াছেন, তখন আজিমগঞ্জে আর কেহই তাঁহাকে স্বগৃহে স্থান দিবেন না।* অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি প্রতিবেশী বাল্যবন্ধু বাবু ধরমচাঁদ শ্রীমালের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। ধরমচাঁদ বাবু জনেক সম্ভ্রান্ত জমীদার এবং গোলালচাঁদের প্রিয় অকপট সুহৃৎ ছিলেন। বিশেষতঃ, তিনি কাহাকেও বড় একটা গ্রাহ্য করিতেন না। বন্ধুর বিপদের কথা শুনিয়া তিনি তাঁহাকে সাদরে স্বগৃহে স্থান দিলেন। গোলালচাঁদ "অকূল পাথারে"

---

* কথিত আছে, আজিমগঞ্জে মায়াকুঙার বিবির এইরূপই প্রতাপ ছিল।

আশ্রয় পাইলেন এবং বন্ধুর সহিত উপস্থিত বিপদ হইতে সমুত্তীর্ণ হইবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। ১২৩০ সালে এই ঘটনা উপস্থিত হয়।

মায়াকুঙার বিবি গোলালচাঁদকে দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করা অস্বীকার করিলেন এবং অনেকের অনুরোধ সত্ত্বেও তাঁহাকে আর স্বগৃহে প্রবেশ করিতে দিলেন না। গোলালচাঁদ অল্পবয়স্ক হইলেও তেজস্বী ছিলেন। তিনিও মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন "শক্তি থাকে, তবে স্বতেজে ঐ গৃহে প্রবেশ করিব, এবং বিষয় সম্পত্তি দখল করিব; নতুবা দরিদ্র সন্তান ছিলাম, দরিদ্রই থাকিয়া যাইব।" বন্ধুবর ধরমচাঁদ শ্রীমালের সহিত পরামর্শ করিয়া গোলাল-চাঁদ বহরমপুরে গমন করিলেন। বহরমপুরনিবাসী অনেক ধনবান্ ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তির সহিত ধরমচাঁদের আলাপ ছিল। গোলালচাঁদের দুরবস্থার কথা শুনিয়া অনেকেই তাঁহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগি-লেন। কেহ কেহ তাঁহাকে মোকদ্দমা করিবার নিমিত্ত টাকা কর্জ্জ দিতেও প্রতিশ্রুত হইলেন। গোলালচাঁদ মোকদ্দমা করিলে যে জয়ী হইবেন, ইহা প্রায় সকলেই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি অজ্ঞাতনামা হইলেও অনেকেই যে তাঁহাকে টাকা কর্জ্জ দিতে প্রস্তুত

হইবেন, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? বলা বাহুল্য, বাবু নিমাইচরণ সেন নামক জনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মধ্যবর্ত্তিতায় বহরমপুরনিবাসী বাবু ললিত মোহন সেন এবং সুবিখ্যাত ডাক্তার ৺ রামদাস সেনের পিতা বাবু লালমোহন সেন গোলালচাঁদকে প্রয়োজনীয় অর্থ দিলেন। নিমাইচরণ বাবু গোলালচাঁদের মোকদ্দমার "তদ্বির" করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন এবং গোলালচাঁদও মোকদ্দমায় জয়লাভ করিলে, তাঁহাকে তাঁহার পারিশ্রমিক স্বরূপ সমগ্র জমিদারীর সার্দ্ধ এক আনা পরিমিত অংশ প্রদান করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। এই মর্ম্মে একটী চুক্তিনামাও সম্পাদিত হইয়া গেল।

১৮২৬ খৃঃ অব্দে মায়াকুঙার বিবির বিরুদ্ধে মহাড়ম্বরে মোকদ্দমা "রুজু" হইয়া গেল। মায়াকুঙার বিবির ক্রোধ ও ক্ষোভের পরিসীমা রহিল না। তিনি আস্পর্দ্ধাশীল গোলালচাঁদকে বিধিমতে "জব্দ" করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু গোলালচাঁদ সহজে ভীত বা বিচলিত হইবার যুবা ছিলেন না। "মন্ত্রের সাধন, কিম্বা শরীর পতন" এইরূপ অটল ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইয়া তিনি নিজ কার্য্যোদ্ধারে রত রহিলেন। এই সময়ে তাঁহাকে নানাবিধ কষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়া-

ছিল। তিনি স্বহস্তে পাক করিতে জানিতেন না, এবং লোক রাখিয়া পাক করাইবারও তখন তাঁহার সঙ্গতি ছিল না; সুতরাং কথিত আছে, তিনি দুই বৎসর কাল প্রায় দুগ্ধ পান করিয়াই প্রাণধারণ করিয়াছিলেন। নিমাই চরণ বাবু খরচ পত্রের জন্য তাঁহাকে যৎসামান্য অর্থ প্রদান করিতেন, তদ্দ্বারাই তিনি গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া লইতেন। মোকদ্দমা চলিবার কালে তিনি আলস্যে কিছুমাত্র সময় নষ্ট করেন নাই। নিমাইচরণ বাবুর সামান্য জমিদারী ছিল; গোলালচাঁদবাবু তাঁহারই জমিদারী সেরেস্তায় দিবসের অধিকাংশ ভাগ যাপন করিয়া জমিদারী কার্য্য শিক্ষা করিতেন। ভবিষ্যতে এই শিক্ষা তাঁহার যথেষ্ট উপকারে আসিয়াছিল। মায়াকুঙার বিবি গোলালচাঁদকে দত্তকপুত্র রূপে গ্রহণ করা একবারে অস্বীকার করিয়া মোকদ্দমায় "জবাব" দিলেন। মহাড়ম্বরে মোকদ্দমা চলিল। উভয় পক্ষেই বিস্তর অর্থের অপব্যয় হইল। কিন্তু সত্য গুপ্ত থাকিল না। আদালতের সূক্ষ্ম বিচারে গোলালচাঁদের দত্তকপুত্র রূপে গৃহীত হওয়া প্রমাণিত হইল। গোলালচাঁদই সমস্ত বিষয়ের অধিকারী স্বীকৃত হইলেন। মায়াকুঙার বিবি কেবলমাত্র গ্রাসাচ্ছাদন পাইবার উপযুক্ত বিবেচিত হইলেন।

বিবি সাহেবা নিম্ন আদালতের বিচারের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করিলেন ; কিন্তু সেখানেও তাঁহার পরাজয় হইল। প্রিভি কৌন্সিল পর্য্যন্ত মোকদ্দমা যাইবার উপক্রম হইল। কিন্তু এই সময়ে (১৮৩৩ খৃঃ অব্দে) গোলালচাঁদ বাবুর সবিশেষ চেষ্টায় এবং জগৎশেঠ প্রভৃতি কতিপয় মহাশয়-গণের মধ্যবর্ত্তিতায় মাতা পুত্রের মধ্যে বিবাদ মিটিয়া গেল। গোলালচাঁদবাবু সাম ও দান দ্বারা বিবাদের শান্তি করিলেন। মায়াকুঙারবিবি আমরণ অর্দ্ধেক সম্পত্তি ভোগ করিতে পারিবেন, ইহাই স্থিরীকৃত হইল। গোলালচাঁদ বাবু এই নিষ্পত্তিতে সম্মত হইয়া অপরার্দ্ধ বিষয় গ্রহণ করিলেন।

গোলালচাঁদ বাবুর প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হইল। যে গৃহ হইতে একদিন তিনি যারপর নাই অবমানিত হইয়া বিতাড়িত হইয়াছিলেন, সেই গৃহের কর্ত্তা হইয়া তিনি তন্মধ্যে স্বতেজে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু গর্ব্বিতা মায়া-কুঙার বিবি সেই গৃহে আর বাস করিতে চাহিলেন না। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, মেঘরাজবাবু গঙ্গার ঘাটের সন্নি-কটে একটী বাটী প্রস্তুত করিয়াছিলেন ; মায়াকুঙার বিবি এক্ষণে সেই স্থানে বাস করিতে লাগিলেন।

গোলালচাঁদ বাবু অর্দ্ধেক সম্পত্তির অধিকারী হইয়া

পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে নিমাইচরণ বাবুকে সমগ্র বিষয়ের সার্দ্ধ এক আনা পরিমিত অংশ প্রদান করিলেন। এক জমিদারীর তিন ব্যক্তি অধিকারী হওয়াতে তিনটী বিভিন্ন "সেরেস্তা" হইল। এই কারণে সকলেই জমিদারী কার্য্য-পরিচালনে বিস্তর অসুবিধা ভোগ করিতে লাগিলেন। গোলালচাঁদবাবুর প্রস্তাবে মায়াকুঙার বিবি বার্ষিক কতিপয় সহস্র মুদ্রা পাইবার সর্ত্তে তাঁহাকে আপন অর্দ্ধাংশ ছাড়িয়া দিলেন এবং নিমাইচরণ বাবুও একটী জমিদারী লাট পাইয়া সমগ্র সম্পত্তিতে আপনার সার্দ্ধ এক আনা অংশ পরিত্যাগ করিলেন। এইরূপে গোলালচাঁদবাবু সমস্ত জমিদারীরই অধিকারী হইলেন।

এই ঘটনার পর মায়াকুঙার বিবি গোলালচাঁদ বাবুর আর কোনও রূপ বিপক্ষতাচরণ করেন নাই। তিনি গঙ্গার ঘাটের নিকটবর্ত্তী সেই বাটীতেই থাকিয়া পরিবার-বর্গের সংবাদাদি লইতেন। ১২৫০ সালে মায়াকুঙার বিবি তীর্থ-পর্য্যটনে বহির্গত হইয়া সার্দ্ধ এক বৎসর পরে গৃহে প্রত্যাগমন করেন। আজিমগঞ্জে তিনি একটী মন্দির স্থাপন করেন; এই মন্দির ১২৬২ সালের বৈশাখ মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১২৬৬ সালে ভাদ্র কৃষ্ণপঞ্চমীতে ৬৮ বৎসর বয়ঃক্রমে মায়াকুঙার বিবি পরলোক গমন করেন।

মাযাকুণ্ডার বিবি এক অদ্ভুত প্রকৃতির রমণী ছিলেন। তিনি বিলক্ষণ গর্ব্বিতা থাকিলেও কাহারও প্রতি অনর্থক রূক্ষ ব্যবহার করিতেন না। তাঁহার বচন বড়ই মিষ্ট ছিল। কাহারও প্রতি কখনও কটু বা কুবাক্য প্রয়োগ করিতেন না। তিনি পরিচ্ছন্নতা অতিশয় ভালবাসিতেন; তাঁহার এই পরিচ্ছন্নতা-প্রিয়তাকে "শুচি বাই" বলিলেও বলা যাইতে পারে। তিনি প্রাতঃকালে, সন্ধ্যায় ও মধ্যাহ্নে বিভিন্ন প্রকার পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিতেন। তিনি একটী নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে যথা সময়ে সকল কার্য্য সম্পাদন করিতেন। আহারের, স্নানের, বিশ্রামের, শয়নের ও বিষয়কর্ম্ম-পর্য্যবেক্ষণের জন্য যে সময় নিরূপিত থাকিত, কদাপি সে সময়ের কোনও ব্যতিক্রম হইত না। এই কারণে তাঁহার স্বাস্থ্যও সুন্দর ছিল। কেহ কখন তাঁহাকে পীড়িত হইতে দেখে নাই; যে পীড়ায় তাঁহার মৃত্যু হয়, তাহাই তাঁহার প্রথম ও শেষ পীড়া।

গোলাপচাঁদবাবু সমগ্র বিষয়ের অধিকারী হইয়া তাহারি সুবন্দোবস্তে মনোনিবেশ করিলেন। প্রজারা যাহাতে উৎপীড়িত না হয়, অধস্তন কর্ম্মচারিবর্গ যাহাতে তাঁহাকে বঞ্চনা করিতে না পারে এবং ঋণদায় হইতেও যাহাতে তিনি মুক্ত হইতে পারেন, তৎসমুদায়ের যথোচিত

উপায় বিধানে তিনি সবিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার একটী বন্দোবস্ত বড়ই সুন্দর ও তাৎকালিক রাজ-পুরুষগণের অতিশয় সন্তোষকর হইয়াছিল। দিনাজপুর অঞ্চলে জমিদারীর মধ্যে ১৯ প্রকার "সায়রাতের আবোয়াব" ছিল। তহশীলদার ও গোমস্তারা এই সায়রাতের উপলক্ষ করিয়া প্রজাগণকে পীড়ন পূর্ব্বক বিলক্ষণ দুই পয়সা উপার্জ্জন করিত; অথচ গোলালচাঁদ বাবুর গৃহে এক পয়সাও প্রবেশ করিত না। এই কারণে তিনি প্রজাগণের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে একটা বন্দোবস্ত করিলেন। বনকর, জলকর, ফলকর, ঘাসকর প্রভৃতি গ্রামস্থ লোকের সাধারণ ভোগ্যবস্তু হইল; তৎপরিবর্ত্তে প্রত্যেক প্রজা জমিদারকে তাহার জমার প্রত্যেক টাকায় /৫ পাঁচ পয়সা হিসাবে কর প্রদান করিতে লাগিল। এই বন্দোবস্তের ফলে প্রজারা তহশীলদারের অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পাইল ও কতকগুলি সাধারণ সত্ব ভোগ করিতে লাগিল এবং গোলালচাঁদবাবুরও আয়ের মাত্রা কিছু বাড়িয়া গেল। এইরূপ বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার জন্য গোলালচাঁদ বাবু আপনার ঋণভার অনেকটা লঘু করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মাসীকুঙার বিবির সহিত মোকদ্দমা করিবার জন্য তিনি মহাজনদিগের নিকট যে কর্জ্জ লইয়াছিলেন, সেই কর্জ্জ

পরিশোধের নিমিত্ত তাঁহাকে আজীবন কষ্টভোগ করিতে হয়। উত্তমর্ণগণের জ্বালাতে তিনি আজিমগঞ্জে বাসকরা কষ্টকর বিবেচনা করিয়াছিলেন। এই কারণে তিনি দিনাজপুরেই বৎসরের অধিকাংশ সময় যাপন করিতেন। কিন্তু তিনি কাহাকেও বঞ্চনা করিবার জন্য এক মুহূর্ত্ত ভ্রমেও চিন্তা করেন নাই। সাধুতাই তাঁহার চরিত্রের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অলঙ্কার ছিল। এই সম্বন্ধে এইরূপ একটী গল্প আছে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, গোলালচাঁদ বাবু বহরমপুরনিবাসী বাবু লালমোহন সেনের নিকট অনেক টাকা কর্জ্জ লইয়াছিলেন। কিন্তু লালমোহন বাবুর প্রাপ্য টাকা "তামাদী স্বত্রে ,বারিত" হইয়াছিল। তথাপি তিনি গোলালচাঁদ বাবুর নামে টাকার জন্য অভিযোগ উপস্থিত করিলেন; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কারণে মোকদ্দামায় পরাজিত হইলেন। লালমোহন বাবু এই কারণে গোলালচাঁদ বাবুর উপর বিরক্ত ও হতশ্রদ্ধ হন। কিন্তু গোলালচাঁদ বাবুর তৎকালে ঋণ পরিশোধ করিবার ক্ষমতা ছিল না। সুতরাং তিনি লালমোহন বাবুকে টাকা প্রত্যর্পণ করিয়া আপনার সাধুতার পরিচয় প্রদান করিতে অসমর্থ হইলেন। কিয়দ্দিবস পরে গোলালচাঁদ বাবু লালমোহন বাবুর বাটীতে সহসা একদিন উপস্থিত হইলেন। লালমোহন বাবু

তাঁহাকে দেখিয়া যেন বিরক্তি ও অবজ্ঞা বশতঃই অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বসিলেন। গোলালচাঁদ বাবু তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন "মহাশয়, আমি আপনার নিকট এখন কোনও অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতে আসি নাই। আপনি টাকা কর্জ্জ দিয়া একদিন আমার যে বিলক্ষণ উপকার করিয়াছেন, তাহা আমার স্মরণ আছে। আপনার প্রাপ্য টাকা তামাদি সূত্রে বাধিত হইলেও আমি আপনার নিকট ঋণমুক্ত হই নাই। অসামর্থ্য প্রযুক্তই আপনার টাকা পরিশোধ করিতে পারি নাই। কি জানি আপনি আমাকে অসাধু মনে করেন, এই জন্য টাকার পরিবর্ত্তে অন্য কতিপয় বহুমূল্য অলঙ্কার লইয়া আসিয়াছি। আপনার প্রাপ্যের পরিবর্ত্তে তাহাই গ্রহণ করিলে সুখী হইব।" এই বলিয়া গোলালচাঁদ বাবু সেই অলঙ্কারগুলি বাহির করিয়া লালমোহন বাবুকে অর্পণ করিলেন। লাল মোহন বাবুও গোলালচাঁদ বাবুর এই অপূর্ব্ব ব্যবহারে যারপর নাই চমৎকৃত হইলেন।

গোলালচাঁদ বাবুর যেরূপ প্রভূত নৈতিক বল ছিল, তাঁহার শারীরিক বলও তদপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন ছিল না। শারীরিক বলবিক্রম হেতু তাঁহার অপরিসীম সাহস ছিল। একবার তিনি সাহস মাত্র অবলম্বন করিয়া

একদল ডাকাইতকে যেরূপে বিতাড়িত করিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। গোলালচাঁদবাবু নৌকা যোগে একবার দিনাজপুর যাইতেছিলেন। বজরা ব্যতীত তাঁহার সমভিব্যাহারে আরও চারিখানি নৌকা ছিল। দাঁড়ি, মাঝি, ভৃত্য, খানসামা লইয়া তাঁহার সঙ্গে অনেকগুলি লোকজন ছিল। গোলালচাঁদবাবু সপত্নীক দিনাজপুরে যাইতেছিলেন। পত্নীর সঙ্গে চারিজন দাসী ছিল। আজিমগঞ্জ হইতে প্রায় ২০ মাইল দূরে গিরিয়া নামে একটী স্থান আছে, এই স্থানের সন্নিকটে একটী বিস্তৃত চরের পার্শ্বে নৌকা লাগাইয়া ইঁহারা রন্ধনাদি করিতেছিলেন। চৈত্রমাস, বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল। এমন সময়ে কোন ব্যক্তি আসিয়া গোলালচাঁদবাবুকে সংবাদ দিল যে, এক দল দুর্দ্দান্ত ডাকাইত সেই রাত্রিতে তাঁহাদের নৌকা আক্রমণ করিবে। ডাকাইতের কথা শুনিয়া দাঁড়ি, মাঝি, ভৃত্য প্রভৃতি সকলেই পলায়ন করিল; কিন্তু গোলালচাঁদ বাবু কোথায়ও পলাইবার সঙ্কল্প করিলেন না। সঙ্গে জনেক বিশ্বস্ত খানসামা ও উমেদমল দুগড় নামক জনেক কর্ম্মচারী ভিন্ন তাঁহার নিকটে আর কোনও পুরুষ ব্যক্তি রহিল না। ক্রমে সন্ধ্যা হইল; রাত্রি প্রায় দশটার সময় গোলালচাঁদবাবু দেখিলেন, সেই বিস্তৃত

চরের অপরদিকে অগণ্য মশাল জলিতেছে এবং বহুসংখ্যক ব্যক্তি বিকট কোলাহল করিয়া তাঁহাদের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। গোলালচাঁদবাবু অবিলম্বে তাহাদিগকেই ডাকাইত বলিয়া বুঝিতে পারিলেন; তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া তদ্দণ্ডেই যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইলেন। উমেদ মল ও পূর্ব্বোক্ত খানসামা বন্দুক লইয়া তাঁহার সমভিব্যাহারে চলিল। গোলালচাঁদ বাবু নৌকা ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে দাসীগণকে ও স্ত্রীকে * দুইটী প্রতিজ্ঞা-সূত্রে আবদ্ধ করিলেন। পত্নী প্রাণকুমারী বিবি গোলাল চাঁদ বাবুকে যুদ্ধে নিহত হইতে দেখিলে, তাঁহার সমুদায় মূল্যবান অলঙ্কার ও জহরৎ যেন গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করেন এবং দ্বিতীয়তঃ তিনিও যেন গঙ্গাজলে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া দারুণ অপমান ও বৈধব্যরূপ কঠোর কষ্ট হইতে আপন'কে রক্ষা করেন। পত্নী ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া তাঁহার নিকট এই দুইটী প্রতিজ্ঞা করিলে, তিনি নিশ্চিন্তমনে ও অদম্য উৎসাহে নৌকা হইতে বহির্গত হইলেন। ডাকাইতদিগকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে দেখিয়া গোলালচাঁদ বাবু অবিশ্রান্ত-

* ইনি গোলাল চাঁদ বাবুর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী প্রাণকুমারী বিবি। ইনি এই সময়ে অল্প বয়স্কা ছিলেন।

ভাবে বন্দুক ছুড়িতে লাগিলেন এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে বিকট চীৎকার দ্বারা নদীতট প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন। উমেদ মল ও খানসামাও সেই চীৎকারে যোগ দেওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন অগণ্য ব্যক্তি ডাকাইতগণের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। গোলালচাঁদ বাবু তাঁহার দুই মাত্র অনুচরের কণ্ঠের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া তারস্বরে চীৎকার ও কটুবাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে ডাকাইতগণকে যুদ্ধার্থ আহ্বান এবং ক্রমাগত বন্দুক ছুড়িয়া তাহাদের হৃদয়ে ভীতি সমুৎপাদন করিতে লাগিলেন। ডাকাইতেরা সাহসভরে একবার অগ্রসর হয়, আবার বন্দুকের গুলির ভয়ে পশ্চাদ্গামী হইয়া যায়। এইরূপে তাহারা কয়েকবার অগ্রসর ও কয়েকবার পশ্চাদ্গামী হইল। এদিকে গোলালচাঁদ বাবুও তাঁহার দুই অনুচরের সহিত নানাবিধ স্বরের অনুকরণ পূর্ব্বক মুহূর্ত্তের জন্যও বন্দুক ছুড়িতে নিরস্ত হইলেন না। এইরূপে প্রায় সমস্ত নিশা অতিবাহিত হইয়া গেল। নিশাবসানে পূর্ব্বা-কাশ যখন পরিষ্কৃত হইয়া উঠিল এবং গঙ্গাবক্ষে দুই একটী যাত্রী-নৌকা দৃষ্ট হইতে লাগিল। সেই সময়ে ডাকাইতেরা পরাজয় মানিয়া প্রকাশভয়ে একে একে পলায়ন করিল। প্রভাত সময়ে সেই বিস্তৃত চরের মধ্যে একটী জনপ্রাণীও

নয়নগোচর হইল না। এইরূপে গোলালচাঁদবাবু এক-মাত্র সাহস অবলম্বন করিয়া সে যাত্রা ডাকাইতের হস্ত হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। এই ঘটনা ১২৫৫ সালে সংঘটিত হইয়াছিল।

গোলালচাঁদবাবু দেখিতে অতিশয় সুপুরুষ ব্যক্তি ছিলেন। চক্ষু বিশাল ও আয়ত ; দেহ সুদীর্ঘ, নাতিস্থূল, নাতিক্ষীণ ও গৌরবর্ণ ছিল। তাঁহার মুখমণ্ডলে চরিত্রের দৃঢ়তা যেন সঞ্চিত ছিল, দেখিলেই সহসা মনে ভয়ের সঞ্চার হইত। তিনি বিলক্ষণ আত্মাভিমানী ছিলেন, এবং কাহাকেও যেন ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। লোকে তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান করিত। তিনি দাবা খেলিতে বড় ভাল বাসিতেন এবং "ছিপে" (লম্বা নৌকায়) ও অশ্বে আরোহণ করিতে বিলক্ষণ অনুরাগ প্রকাশ করিতেন।

গোলালচাঁদবাবুর দুই বিবাহ। মায়াকুণ্ডার বিবি কর্তৃক গৃহ হইতে বিতাড়িত হইবার পূর্ব্বে তিনি পাতাস-কুমারীবিবিকে বিবাহ করেন। পাতাসকুমারী ধনবানের কন্যা ছিলেন। তাঁহার পিতা তাঁহার বিবাহে যে প্রকার আড়ম্বর করিয়াছিলেন, শুনা যায় এ পর্য্যন্ত আর কাহারও বিবাহে সেরূপ আড়ম্বর হয় নাই। পাতাসকুমারীবিবি গুণবতী রমণী ছিলেন। তাঁহার ন্যায় পতিব্রতা, কষ্টসহিষ্ণু

ও দয়াবতী রমণী অতীব বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। স্বামী গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়া নিরাশ্রয় হইলে তিনি পিত্রালয়ে গমন করেন এবং তাঁহার দুঃখে ম্রিয়মাণা হইয়া কষ্টে কাল যাপন করেন। স্বামীর দুরবস্থার সময় তিনি তাঁহার নিকট ভ্রমেও একদিন একটীও অভিলষিত দ্রব্য প্রার্থনা করেন নাই; অধিকন্তু যাহাতে স্বামীর চিন্তার যৎসামান্যও লাঘব হইতে পারে তাহারই চেষ্টা করিতেন। ইনি সততই ব্রত উপবাস লইয়া থাকিতেন। ১২৪০ সালে ইহাঁর গর্ভে একটী পুত্র সন্তান জন্মে; কিন্তু তাহা শৈশব-অবস্থাতেই বিনষ্ট হইয়া যায়। পুত্রলাভের জন্য ইনি কোন কষ্টকেই কষ্ট বলিতেন না। বহু বিঘ্ন বিপত্তির পর স্বামীকে পুনর্ব্বার সমগ্র বিষয় সম্পত্তির অধিকারী হইতে দেখিয়া ইনি যারপর নাই আনন্দিত হইয়া ছিলেন, কিন্তু বহুদিন ইহাঁকে স্বামীর সৌভাগ্য-সম্পদের অংশভাগিনী হইতে হয় নাই।

গোলালচাঁদবাবুর দ্বিতীয়া পত্নীর নাম প্রাণকুমারী-বিবি। ইনি ১২৪৩ সালের আষাঢ় শুক্ল চতুর্দ্দশীতে জন্ম-গ্রহণ করেন। ১২৫৩ সালের অগ্রহায়ণ মাসে পাতাস-কুমারীবিবির মৃত্যু হইলে, গোলালচাঁদ বাবু ঐ সালের ফাল্গুন মাসে ইহাকে বিবাহ করেন। ১২৫৬ সালে ইহাঁর

গর্ভে একটী পুত্র সন্তান জন্মে ; কিন্তু এই পুত্রটিও জন্মের কতিপয় দিবস পরে কালগ্রাসে পতিত হয়।

গোলালচাঁদবাবু দিনাজপুরে অবস্থিতি করিতে করিতে জ্বরাতিসার রোগে আক্রান্ত হন। নানারূপ চিন্তা ও দুর্ভাবনায় ইতঃপূর্ব্বেই তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়াছিল ; এক্ষণে উক্ত রোগে আক্রান্ত হওয়াতে তিনি জীবনাশা পরিত্যাগ করিলেন। মৃত্যু আসন্ন জানিয়া তিনি আপনার শ্বশ্রূ ও শ্যালককে দিনাজপুরে আসিতে পত্র লিখিলেন। শ্বশ্রূঠাকুরাণী পত্র পাঠ মাত্র দিনাজপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং যথা সময়ে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া জামাতার শেষ অবস্থা দর্শন করিলেন। গোলালচাঁদবাবু এক অল্পবয়স্কা বিধবা পত্নী রাখিয়া ১২৫৭ সালের ৩১শে বৈশাখ অমাবস্যা তিথিতে ইহলোক হইতে অবসৃত হইলেন। তাঁহার মৃত্যুর কতিপয় দিবস পরে শ্যালক ভৈরবদান লুনাওৎ দিনাজপুরে আসিয়া উপনীত হইলেন।

গোলালচাঁদবাবু মৃত্যুর পূর্ব্বে একটী উইলপত্র সম্পাদন করিয়া যান। এই উইলে তিনি পত্নীকে দত্তকপুত্র গ্রহণের অনুমতি প্রদান করেন। এবং পত্নী, শ্যালক, জনেক বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ও অপর এক ব্যক্তিকে বিষয় সম্পত্তির

"ট্রষ্টি" নিযুক্ত করেন। তিনি এই উইলে কতিপয় বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর মাসিক বৃত্তিরও বন্দোবস্ত করিয়া দেন।

প্রাণকুমারী বিবি দিনাজপুরে স্বামীর ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ভ্রাতা ও জননীর সহিত আজিমগঞ্জে প্রত্যাগমন করিলেন। ভ্রাতা ভৈরবদান লুনাওৎ বুদ্ধিমান্ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন; তিনি ভগ্নীর বিষয় কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রাণকুমারীবিবি দত্তক পুত্র গ্রহণে স্বামীর আজ্ঞা পাইযাছিলেন; এক্ষণে একটী উপযুক্ত বালকের অনুসন্ধান হইতে লাগিল। ভৈরবদানের ইচ্ছা, একটী প্রাপ্ত বয়স্ক যুবক দত্তক পুত্ররূপে গৃহীত হয়; তাহা হইলে সে অত্যল্পকাল মধ্যেই বিষয়কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতে পারিবে। এদেশে ঈদৃশ কোন বালক প্রাপ্ত না হওযাতে পশ্চিম দেশ হইতে ঈশ্বরদাস নামে একটী যুবক আনীত হইল। কিন্তু প্রাণকুমারীবিবি অতিশয় বুদ্ধিমতী ছিলেন; তিনি ভাবী পুত্রকে তদপেক্ষাও অধিক বয়স্ক দেখিয়া তাহাকে দত্তকপুত্রের অনুপযুক্ত মনে করিলেন। সুতরাং ঈশ্বরদাস দত্তকপুত্ররূপে গৃহীত হইল না। এই সময়ে আজিমগঞ্জ নিবাসী ক্ষেৎসিংহ পাটোয়ারী নামে এক ব্যক্তি ছিলেন; ইনি পুর্ণিয়ার অন্তর্গত জলকী-নগরে ব্যবসায় বাণিজ্য করিতেন। গোপীচাঁদ নামে ইহার

একটী পুত্র ছিল। * গোলালচাঁদবাবু শিশুমাত্রকেই অতিশয় স্নেহ করিতেন। গোপীচাঁদ আজিমগঞ্জ থাকা কালে দাসীর ক্রোড়ে মধ্যে মধ্যে গোলালচাঁদবাবুর বাটীতে নীত হইত। গোলালচাঁদবাবু এই বালকটীকে দেখিয়া অতীব প্রীত হইতেন। সর্ব্বদা গতায়াতের জন্য বালকের প্রতি তাঁহার স্নেহেরও সঞ্চার হয়; সেই কারণে তিনি ইহাকে দত্তক পুত্র গ্রহণের জন্য একবার অভিলাষও প্রকাশ করেন। কিন্তু গোপীচাঁদের জনক জননী তাঁহার প্রস্তাব শুনিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। গোপী জানকী নগরে অবস্থানকালে একবার কঠিন বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়। তৎপূর্ব্বে তাহার একটী অগ্রজও কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করে। গোপীচাঁদ কোন রূপে আরোগ্যলাভ করে; কিন্তু তাহার জনক জননী সর্ব্বদাই তাহার জন্য শঙ্কিত থাকিতেন। একবার জনেক সন্ন্যাসী আসিয়া তাঁহাদিগকে বলেন, "এই বালক সৌভাগ্যশালী; তোমরা ইহাকে কোনও ধনবান্ ব্যক্তিকে প্রদান কর; নতুবা তোমাদের ভাগ্যে এই বালক বহুকাল জীবিত থাকিবে না।" এই সময়ে গোলালচাঁদবাবুর মৃত্যু হয়

* ক্ষেৎসিংহ পাটোয়ারীর অন্য এক পুত্রের নাম মাহাতাবচাঁদ ওরফে ঋাবু বাবু।

এবং ঈশ্বরদাস তৎপত্নী কর্ত্তৃক দত্তকপুত্ররূপে গৃহীত হইবার নিমিত্ত পশ্চিম দেশ হইতে আনীত হয়। প্রাণকুমারী বিবি ঈশ্বরদাসকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিতে অসম্মত হইলে, ভৈরবদান লুনাওৎ গোপীচাঁদকে গ্রহণ করিবার জন্য তাহার পিতাকে পত্র লিখেন। পিতা ক্ষেৎসিংহ সন্ন্যাসীর বাক্য স্মরণ করিয়া পুত্রকে দান করাই স্থির করিলেন। তদনুসারে ১২৫১ সালের আশ্বিনমাসে তিনি ও তাঁহার পত্নী গোপীচাঁদ ও তাঁহার একটী ভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া আজিমগঞ্জে আসিয়া উপনীত হইলেন। গোপীচাঁদ যথাশাস্ত্র প্রাণকুমারীবিবি কর্ত্তৃক পুত্ররূপে গৃহীত হইল। ১২৫৪ সালের বৈশাখমাসে গোপীচাঁদের জন্ম হইয়াছিল; সুতরাং দত্তকপুত্ররূপে গৃহীত হইবার সময় তাহার বয়ঃক্রম সার্দ্ধ তিন বৎসর ছিল। দত্তকপুত্র রূপে গৃহীত হইবার পর গোপীচাঁদের নাম শ্বেতাভচাঁদে পরিণত হয়।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, মায়াকুঁওার বিবি ১২৬৬ সালের ভাদ্রমাসে পরলোক গমন করেন। সুতরাং তাঁহাকে গোলালচাঁদ বাবুর মৃত্যুশোক সহ্য করিতে হয়। শ্বেতাভচাঁদবাবু দত্তকপুত্র রূপে গৃহীত হইলে বৃদ্ধা মায়াকুমারী বালককে যারপর নাই স্নেহ করিতেন। শ্বেতাভচাঁদবাবু

প্রায় সর্ব্বদাই তাঁহার নিকটে থাকিতেন। প্রাণকুমারী বিবি কোন কারণে তাড়না বা ভৎর্সনা করিলে, বৃদ্ধা পিতামহী বধুর উপর যারপর নাই বিরক্ত হইতেন। বৃদ্ধা মৃত্যুর পূর্ব্বে বালক শ্বেতাভচাঁদকে একটী অমূল্য উপদেশ প্রদান করিয়া যান, তাহা নাহারবংশীয়দিগের চিরকাল স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। তিনি শ্বেতাভচাঁদবাবুকে বলিয়াছিলেন, "ভাই, কখনও গৃহ-বিবাদে প্রবৃত্ত হইও না; গৃহ-বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াই নাহারবংশের অধোগতি হইয়াছে, তুমি সর্ব্ববিষয়ে তোমার মাতার অনুগত হইয়া থাকিবে; বিবাদের কারণ উপস্থিত হইলেও তুমি কদাচ বিবাদ করিবে না।" শ্বেতাভচাঁদবাবু বৃদ্ধা পিতামহীর এই শেষ উপদেশ বাক্য জীবনে বিস্মৃত হন নাই।

প্রাণকুমারীবিবি।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, প্রাণকুমারী বিবি ১২৪৩ সালের আষাঢ় শুক্লচতুর্দ্দশীতে জন্মগ্রহণ করেন। ১২৫৩ সালের ফাল্গুনমাসে কৃষ্ণনবমীতিথিতে গোলালচাঁদবাবুর সহিত

ইহার বিবাহ হয়। ১২৫৬ সালে ইহার গর্ভে একটী পুত্র সন্তান জন্মে; কিন্তু শিশুটি জন্মের কয়েক দিবস পরেই কালগ্রাসে পতিত হয়। ১২৫৭ সালের ৩১ শে বৈশাখ অমাবস্যা তিথিতে গোলালচাঁদবাবুর পরলোক হয়; সুতরাং প্রাণকুমারীবিবি চতুর্দ্দশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে বিধবা হন। স্বামীর মৃত্যুর পর ইঁহার ভ্রাতা ভৈরবদান লুনাওৎ কিয়দ্দিবস বিষয়কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করেন। ১২৫৭ সালের আশ্বিনমাসের শেষভাগে প্রাণকুমারী বিবি শ্বেতাভচাঁদবাবুকে দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। ১২৬২ সালের ভাদ্র মাসে ইঁহার ভ্রাতা ভৈরবদানের মৃত্যু হয়। সেই অবধি প্রাণকুমারীবিবি স্বয়ং বিষয় কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ করিতে আরম্ভ করেন এবং নাবালক শ্বেতাভচাঁদেরও অভিভাবিকা হন। প্রাণ-কুমারী বিবি অল্পবয়স্কা হইলেও এরূপ বুদ্ধিমত্তা ও যোগ্যতার সহিত বিষয়কার্য্য চালাইতে লাগিলেন যে, তাহা অনেকেরই বিস্ময়ের বিষয় হইল। ইনি সাতিশয় বুদ্ধিমতী ও দূরদর্শিনী ছিলেন এবং ইঁহার প্রচুর বিচার ক্ষমতাও ছিল। কোনও গুরুতর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইলে, প্রায় সকলেই ইহার পরামর্শ লইতে ব্যগ্র হইতেন। ইহার প্রকৃতির একটী বিশেষ গুণ এই ছিল যে, ইনি মিথ্যাকে যারপর নাই ঘৃণা করিতেন। কেহ মিথ্যা কহিলে, তাহার

সহিত বাক্যালাপ করিতে ইনি সম্মত হইতেন না। লোক-চরিত্র-জ্ঞানও ইঁহার যথেষ্ট ছিল; সুতরাং কেহ ইঁহার নিকট চাতুর্য্য প্রকাশ করিতে পারিত না। প্রতিজ্ঞা-পালন করিতেও ইনি সর্ব্বদা তৎপর থাকিতেন। যাহার জন্য কোনও কার্য্য করিতে একবার প্রতিশ্রুত হইতেন তাহা যেরূপেই হউক সম্পন্ন করিয়া দিতেন। ইনি দয়া-বতীও ছিলেন। লোকের কষ্ট মোচনার্থ ইনি অকাতরে অর্থব্যয় করিতেন। পারিবারিক ঋণ থাকা সত্ত্বেও, ইনি প্রতিমাসে কিছু টাকা দানে ব্যয় করিতেন। কিন্তু ইঁহার দানকার্য্য গোপনে নির্ব্বাহিত হইত। কেহ তৎকালে তাহার বিন্দুবিসর্গ জানিতে পারিত না। ইঁহার তত্ত্বাবধানে বৈষয়িক উন্নতিও পরিলক্ষিত হইয়াছিল। গোলালচাঁদ-বাবু যে সমস্ত ঋণ করিয়া যান, ইনি ক্রমে ক্রমে তৎসমুদয় পরিশোধ করেন এবং নাহার বংশের প্রলুপ্ত গৌরবের পুনরুদ্ধার করেন। ইনি বাঙ্গালা ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা সুন্দররূপে লিখিতে পড়িতে ও বলিতে পারিতেন। বিষয়কার্য্যাদি সম্বন্ধে যে সমস্ত চিঠি পত্র আসিত, সমস্তই ইঁহাকে পড়িয়া শুনাইতে হইত। ইনি সকল বিষয়েই সৎপরামর্শ প্রদান করিতেন এবং ইঁহারই আদেশক্রমে সকল কার্য্য সম্পাদিত হইত।

১২৬৬ সালের বৈশাখ মাসে শ্বেতাভচাঁদবাবুর বিবাহ হয়। সেই বৎসর আশ্বিন মাসে প্রাণকুমারীবিবি সপরিবারে তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হন। কিন্তু সেবার বিহার পর্য্যন্তই পর্য্যটন হইয়াছিল। এই বৎসর ভাদ্র মাসে মায়াকুওার-বিবির মৃত্যু হয়।

১২৭৬ সালে আবার সকলে তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হন। এইবার পরেশনাথ পর্ব্বতে * (শিখরজীতে) গমন করিয়াছিলেন। আজিমগঞ্জ নিবাসী অনেক ব্যক্তি এই পর্য্যটনে একত্র বাহির হইয়াছিলেন। তীর্থ যাত্রীর সংখ্যা ২৭৫ ছিল। তীর্থ পর্য্যটন করিয়া যখন ইহারা প্রত্যাগত হইতেছিলেন, সেই সময়ে পথিমধ্যে একটী দারুণ দুর্ঘটনা সমুপস্থিত হয়। সৌভাগ্যক্রমে ইহারা সকলে সে যাত্রা রক্ষা পান। রক্ষা না পাইলে, আজিমগঞ্জ নিবাসী অনেক ওসোয়াল বংশ একেবারে নির্ব্বংশ হইয়া যাইত। নিম্নে ঘটনাটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া গেল।

শীতকাল; পৌর্ণমাসী রজনী। ধরাতল জ্যোৎস্না প্লাবিত; কিন্তু চন্দ্র রাহুগ্রস্ত; সুতরাং জ্যোৎস্না মলিন,

* পার্শ্বনাথ পর্ব্বত। হাজারিবাগ জিলায় অবস্থিত।

নিষ্প্রভ; প্রদোষের ছায়ার ন্যায় নিস্তেজ, অস্পষ্ট ও নিরানন্দজনক। এই সময় বরাকর ষ্টেশন হইতে সীতা-রামপুর অভিমুখে একটী বাষ্পীয় শকট যাত্রী বহন করিয়া নক্ষত্রবেগে রেলের উপর ছুটিতেছিল। যাত্রিগণের মধ্যে অধিকাংশই আজিমগঞ্জ নিবাসী ওসোয়াল। ইহাদের মধ্যে অনেকেই সপরিবারে তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইয়াছেন এবং প্রাণকুমারীবিবিও পুত্রপৌত্রাদিগণে পরিবৃত হইয়া বাষ্পীয় শকটে আরোহণ করিয়াছেন। বাষ্পীয় যান তীরবেগে ছুটিতে লাগিল, কিন্তু সে বেগে যাত্রিগণের শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইল। শকটস্থ দ্রব্য সামগ্রী সকল বেগবশাৎ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল এবং কোন যাত্রীই স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না। শকটের এই অভূতপূর্ব্ব বেগ দেখিয়া আরোহীরা কিছুই স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারিল না এবং প্রায় সকলেই কোনও দুর্ঘটনার আশঙ্কা করিতে লাগিল। এই আশঙ্কা নিতান্ত মিথ্যা হইল না। সহসা শকটের গতিরোধ হইল, শত-বজ্র-নির্ঘোষের ন্যায় একটী ভীষণ শব্দ সমুত্থিত হইল এবং এক ভয়ঙ্কর সংঘর্ষ সমুৎপন্ন হওয়ায় অনেকে আহত এবং অনেকে ভয়ে অচেতন প্রায় হইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে যাত্রিগণের আর্ত্তনাদে গগণমণ্ডল পরিপূর্ণ হইল। সকলে প্রাণভয়ে

শকট হইতে অবতরণ করিয়া দেখিল শকট-চালন্না-দোষে চালক প্রভৃতি সহ এঞ্জিন্ খানি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে যাত্রি-শকটের একটীও বিনষ্ট কিম্বা যাত্রিগণের একজনও হত হয় নাই। প্রাণ রক্ষা হইয়াছে ভাবিয়া সকলেই কৃতজ্ঞ হৃদয়ে আনন্দ ধ্বনি করিতে লাগিল। অদৃষ্টগুণে প্রাণকুমারীবিবি সে যাত্রা পুত্র পৌত্রাদি সহিত এইরূপে রক্ষা পাইয়াছিলেন।

নাহারেরা অনেকবার তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছেন। ১২৮০ সালে তাঁহারা একবার দিল্লী পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। ১২৮৬ সালের আশ্বিন মাসে তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হইয়া তাঁহারা মাঘমাসে বসন্ত পঞ্চমীতে এবং ১২৮৯ সালের শ্রাবণ মাসে বহির্গত হইয়া অগ্রহায়ণ মাসে গৃহে প্রত্যাগত হন। ১২৯৬ সালে তাঁহারা যে পর্য্যটনে বাহির হন তাহাতে তাঁহারা কাটিবার, গুজরাট প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া আসেন। প্রাণকুমারীবিবি এইবার জয়পুরে, পিত্রালয়ে হঠাৎ পীড়িত হইয়া ১২৯৬ সালের ১৪ ই কার্ত্তিক তারিখে পরলোক গমন করেন।

শ্বেতাভচাঁদবাবু।

শ্বেতাভচাঁদবাবু বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া মাতাকে বিষয় কার্য্যাদি পরিচালনে সাহায্য করিতে লাগিলেন। ইনি ১২৫৪ সালের ৫ ই বৈশাখ শনিবারে (ইং ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৭ই এপ্রিলে) জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি কিরূপে প্রাণ-কুমারী বিবি কর্ত্তৃক দত্তক পুত্র রূপে গৃহীত হইয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে; সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ইনি প্রাণকুমারীবিবির অতিশয় আজ্ঞাবহ ছিলেন, এবং কখনও তাঁহার বাক্যের প্রতিবাদ করিতেন না। প্রাণকুমারীবিবি কখন কখন ইহাকে তাড়না করিতেন; সেই অভিমানে ইনি দুই একবার গৃহ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্রও ভ্রমণ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, মুখে তাড়না করিলেও, প্রাণকুমারীবিবি শ্বেতাভ-চাঁদবাবুকে অন্তরে স্নেহ করিতেন। ১২৬৬ সালের বৈশাখ মাসে আজিমগঞ্জ নিবাসী জয়চাঁদ বয়েদের জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত শ্বেতাভচাঁদবাবুর শুভ পরিণয় সম্পন্ন হয়। শ্বেতাভ-চাঁদবাবুর সহধর্ম্মিণী ১২৫৭ সালের ১৯ শে চৈত্র (ইং ১৮৫১ ৩১শে মার্চ্চ) তারিখে জন্মগ্রহণ করেন; সুতরাং বিবাহের সময় তাঁহার বয়ঃক্রম আট বৎসর মাত্র ছিল।

শ্বেতাভচাঁদবাবু বাল্যকাল হইতে, অনেকবার কঠিন পীড়ায় সমাক্রান্ত ও বিপজ্জালে জড়িত হন। প্রাণকুমারী-বিবি কর্তৃক দত্তক পুত্ররূপে গৃহীত হইবার পূর্ব্বে তিনি দুরারোগ্য বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন; সেবার তাঁহার প্রাণের আশা অত্যল্পই ছিল। এখনও তাঁহার মুখমণ্ডলে বসন্তের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক তিনি আরোগ্য লাভ করিলে, তাঁহার জনক জননী তাঁহাকে দান করিবার উদ্দেশে যখন কুশীনদী বাহিয়া আজিমগঞ্জাভিমুখে আসিতে ছিলেন, সেই সময়ে একস্থলে তাঁহাদের নৌকা নদী মধ্যস্থ পর্ব্বতে লাগিয়া মগ্ন হইবার উপক্রম হইয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে জল অল্প থাকায়, তাঁহারা সে যাত্রা রক্ষা পাইয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহার অষ্টম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে আর একবার কঠিন পীড়া হয়। বিবাহের পর বৎসরও কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হওয়াতে, আত্মীয় স্বজনেরা তাঁহার জীবনাশা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। যাহা হউক শ্বেতাভচাঁদবাবু বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া দক্ষতার সহিত বিষয় কার্য্য চালাইতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি মাতা প্রাণকুমারীবিবির পরামর্শ ব্যতীত কোন কার্য্য করিতেন না। তিনি "সাবালক" হইয়া অনেক অসমর্থ ব্যক্তির নিকটে তাঁহার প্রাপ্য টাকা আদায় করেন নাই

ও অসমর্থ প্রজাগণকে খাজানার দায় হইতে মুক্ত করেন। তিনি সুব্যবস্থা করিয়া জমীদারী শাসন করিতেছেন এবং অল্পকাল মধ্যে সমাজে নাহার বংশের পূর্ব্বমর্য্যাদা সংস্থাপিত করিয়াছেন।

শ্বেতাভচাঁদবাবু অনেক সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া সমাজে আদরণীয় এবং গভর্নমেণ্ট কর্ত্তৃক বিশেষরূপে প্রশংসিত হইয়াছেন। ১২৮০ সালে যে দুর্ভিক্ষ হয়, তাহাতে তিনি অন্ন-কষ্ট পীড়িত লোকসাধারণের কষ্ট নিবারণার্থ বিশেষরূপে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্ট তাঁহার পরোপকার প্রবৃত্তি ও অকাতর দানে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে সম্মানিত করিবার জন্য ১২৮২ সালে অর্থাৎ ইংরাজী ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ১২ই মার্চ্চ তারিখে প্রকাশ্য দরবারে "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রদান করেন। আবার ১৮৭৭ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে মহারাণী ভিক্টোরিয়া যখন "ভারত সম্রাজ্ঞী" উপাধি ধারণ করেন, সেই সময়ে গভর্ণমেণ্ট শ্বেতাভচাঁদবাবুকে তাঁহার পরার্থপরতার জন্য একটী Certificate of Honour ও প্রদান করেন।

শ্বেতাভচাঁদবাবু অনেক গুলি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। আজিমগঞ্জে তিনি একটী উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন; এই বিদ্যালয়ে বালকেরা

বিনা বেতনে পড়িতে পাইত। দুঃখের বিষয় যে, বিদ্যা শিক্ষার প্রতি সাধারণের অনুরাগ ও ছাত্রাভাবে বিদ্যালয়-টীকে কিয়দ্দিন পরে তুলিয়া দিতে হয়। এই বিদ্যালয় মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের জুবিলি বর্ষে সংস্থাপিত হইয়াছিল। শ্বেতাভচাঁদবাবু আজিমগঞ্জে আপনাদের বাটীতে বহুদিবসের "সদাব্রত" প্রথা রক্ষা করিতেছেন। সিদ্ধাচলে খড়্গসিংহের সময় যে "সদাব্রত" স্থাপিত হয়, তাহা অদ্যাপি চলিত আছে। ইনি মাতা প্রাণকুমারী-বিবিকে কতিপয় ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করাইয়াছেন। প্রাণ-কুমারীবিবি কাশিমবাজারে একটী ধর্ম্মশালা সংস্থাপিত করিয়াছেন। জুবিলি বর্ষে বৈদ্যনাথ ধামে সাধারণের জন্য একটী উদ্যান ও কূপ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং ১২৮৮ সালে সিদ্ধাচলে ঠাকুরের একটী বৃহৎ রৌপ্য-সিংহাসন প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন। প্রাণকুমারী বিবি বিঠোরার মন্দির প্রস্তুতেরজন্যও এককালে ১৬০০০৲ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। এক্ষণে শ্বেতাভচাঁদ বাবু সাধারণের উপকারার্থ দিনাজপুরের অন্তর্গত শ্বেতাভগঞ্জ নামক স্থানে একটী হাঁসপাতাল বা চিকিৎসালয় সংস্থাপিত করিয়াছেন এবং তাহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ Permanent Endowment করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ইহা ব্যতীত মিরাটের

নিকট হস্তিনাপুর নামক স্থানে ও আবুপাহাড়ে যাইবার প্রাচীন রাস্তার মধ্যে ধর্ম্মশালা স্থাপন করিয়াছেন।

শ্বেতাভচাঁদ বাবু ও তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র মণিলালবাবু উভয়েই মুরশিদাবাদের বহুপ্রকার হিতকর কার্য্যে যোগদান করিয়া থাকেন। উভয়েই মুরশিদাবাদ লোক্যাল বোর্ড ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সভ্য, লালবাগ বেঞ্চের অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট এবং লালবাগ মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার। শ্বেতাভচাঁদ বাবু ১৮৮৩ সাল হইতে অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া দক্ষতার সহিত কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদন করিতেছেন। মণিলালবাবু ১৮৯৩ সালে অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হন। ইনি শিক্ষিত, মার্জ্জিতরুচি ও সাধারণের হিতকর কার্য্যে সবিশেষ উৎসাহী ও মনোযোগী। ইনি গৃহে দুইজন ইংরেজ শিক্ষকের নিকট ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করেন। প্রথম শিক্ষকের নাম Mr. C. J. Owens এবং দ্বিতীয় শিক্ষকের নাম Mr. J. R. D. Fox উভয়েই উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন। শ্বেতাভচাঁদ বাবু কয়েকটি জৈনগ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছেন।* ইঁহার রচিত কয়েকটি সঙ্গীতও আছে। ইনি

* ইঁহারই উদ্যোগে "উচিতবক্তা" নামক একখানি পাক্ষিক-পত্রিকা প্রকাশিত হইত। ইনি যে সকল গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তাহাদের নাম "জৈন স্তবনাবলী," জৈনজ্ঞানাবলী," "নিরস্ত তমোনিধি," "নেম-

স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠ ও নিষ্কলঙ্ক-চরিত্র। মণিলালবাবুও পিতার অনুরূপ হইয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে আজিমগঞ্জ ও বালুচর নিবাসী জৈনদিগের মধ্যে ইঁহাদেরই পরিবারে বিদ্যাশিক্ষার আদর দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহার দ্বিতীয় পুত্র পূরণচাঁদ-বাবু এই বৎসর প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. (B. A.) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বঙ্গদেশস্থ জৈনসম্প্রদায়ের মধ্যে ইনিই প্রথম Graduate। ইঁহাদের জমিদারী সমূহ দিনাজপুর ও মুরশিদাবাদ ও সাঁওতাল পরগণা এই তিন জেলায় অবস্থিত।

শ্বেতাভচাঁদ বাবুর অনেকগুলি পুত্র কন্যা। তাঁহাদের তালিকা জন্মানুক্রমে নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে :—

(১) মণিলাল নাহার ; জন্মের তারিখ ১২৭১ সালের ২৬ সে চৈত্র (খৃঃ অঃ ১৮৬৫ ৭ই এপ্রিল)। বিবাহ, আজিমগঞ্জ নিবাসী রায় বুধসিংহ দুধোড়িয়া বাহাদুরের কন্যার সহিত, ১২৮৫ সালের ১৪ই আষাঢ়। ইঁহার পুত্র কন্যার নাম (ক) প্রথম পুত্র ভ্রমর সিংহ, জন্ম ১২৯০

নাথজীর বারমাসা," "প্রশ্নোত্তরমালা," "নৃসিংহচম্পুকাব্য," "সুগম-ছত্রিশী," "দধিলীলা," "দাদাজীকা স্তবনাবলী," "স্নাত্রবিধি," ধর্ম্মলাওনী" ও "আত্মানুশাসন"।

সাল ২১শে অগ্রহায়ণ; (খৃঃ অঃ ১৮৮৩ ৬ই ডিসেম্বর)। (খ) দ্বিতীয় পুত্র বাহাদুরসিংহ, জন্ম ১২৯২ সাল ৮ই শ্রাবণ; (খৃঃ অঃ ১৮৮৫ ২৩শে জুলাই)। (গ) কন্যা, চাঁদকুমারী; জন্ম ১২৯৩ সালের ২৭শে ফাল্গুন; (খৃঃ অঃ ১৮৮৭ ১০ই মার্চ্চ)। (ঘ) খুদিসিংহ; জন্ম ১৩০০ সালের ১৮ই বৈশাখ; (খৃঃ অঃ ১৮৯৩ ৩০শে এপ্রিল)।

(২) ১২৭৩ সালের শ্রাবণের একাদশীতে একটি কন্যা জন্মের একমাস পরে কালগ্রাসে পতিত হয়।

(৩) ফুলকুমারী বিবি; জন্ম ১২৭৫ সালের ২৮ শে আষাঢ়। (খৃঃ অঃ ১৮৬৫ ১১ই জুলাই)। ১২৮৩ সালের মাঘ মাসে রায় ধনপৎ সিংহ বাহাদুরের দ্বিতীয় পুত্র বাবু নরপৎ সিংহের সহিত বিবাহ হইয়াছে। এখন ইঁহাদের দুইটী পুত্র ও তিনটী কন্যা।

(৪) ১২৭৮ সালের কার্ত্তিকমাসে একটি কন্যার জন্ম হইয়াছিল। তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

(৫) ইন্দ্রকুমারী—জন্ম ১২৮০ সালের ২১শে আষাঢ়, (খৃঃ অঃ ১৮৭৩ ৪ঠা জুলাই)। ১২৮৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসে রায় বুধসিংহ দুধোড়িয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র বাবু ইন্দ্রচাঁদ দুধোড়িয়ার সহিত বিবাহ হইয়াছে। ইঁহাদের একটি পুত্র ও দুইটী কন্যা।

এই ইন্দ্রচাঁদ বাবু ১২৯৬ সালের আষাঢ় মাসে বিলাত গিয়াছিলেন। কার্ত্তিক মাসে ইনি বিলাত হইতে প্রত্যাগত হন।

(৬) পূরণচাঁদ নাহার B. A—জন্ম ১২৮২ সালের ২রা জ্যৈষ্ঠ। (খৃঃ অঃ ১৮৭৫ ১৫ই মে)। আজিমগঞ্জ নিবাসী রায় মেঘরাজ বাহাদুরের পৌত্রীর সহিত ১২৯৪ সালের ফাল্গুন মাসে বিবাহ হইয়াছে। ইহার দুইটী কন্যা ও এক পুত্র। (ক) প্রথম—তারাকুমারী ; জন্ম ১২৯৯ সালের ২১শে বৈশাখ ; (খৃঃ অঃ ১৮৯২ ২রা মে)। (খ) দ্বিতীয়া—মিনাকুমারী ; জন্ম ১৩০০ সালের ২২শে অগ্রহায়ণ। (খৃঃ অঃ ১৮৯৩ ৩ই ডিসেম্বর)। (গ) কেশরীসিংহ নাহার ; জন্ম ১৩০২ সালের ৬ই শ্রাবণ (খৃঃ অঃ ১৮৯৫ ২১শে জুলাই)।

(৭) পুত্র ; জন্ম ও মৃত্যু ১২৮৩ সালের অগ্রহায়ণ মাস।

(৮) প্রসন্নচাঁদ নাহার ; জন্ম ১২৮৫ সালের ১৫ই অগ্রহায়ণ। (খৃঃ অঃ ১৮৭৮ ৩০শে নভেম্বর)। মৃত্যু, ১৮৯১ সালের ২৫শে ডিসেম্বর। বুদ্ধিমান ও বিদ্যানুরাগী ছিল।

(৯) ফতেসিংহ নাহার। জন্ম ১২৮৮ সালের ২৫শে আশ্বিন। (খৃঃ অঃ ১৮৮১ ১০ই অক্টোবর)। ১৩০০ সালের ২০শে ফাল্গুনে (ইং ৩রা মার্চ্চ ১৮৯৪) আজিমগঞ্জ

নিবাসী ৮ হরেকচাঁদ গোলেছার পৌত্রীর সহিত বিবাহ হইয়াছে।

(১০) কুমার সিংহ নাহার। জন্ম ১২৯০ সালের ২২শে আশ্বিন। (খৃঃ অঃ ১৮৮৩ ৮ই অক্টোবর)।

ইহার পর শ্বেতাভচাঁদ বাবুর আর কোন পুত্র কন্যা হয় নাই। এক্ষণে ৪ পুত্র ও দুই কন্যা বর্ত্তমান আছে।